বসন্তে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু চিত্রিত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বসন্তে

বসন্তের হাওয়া দিতে আরম্ভ হইয়াছে। দুপুরটা একটু উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, বোধ হয় পাহাড়ে জায়গা বলিয়া; সকাল আর সন্ধ্যায় একটা ঝিরঝিরে হাওয়া দেয় - তাপে-শৈত্যে মিঠা—কখনও বোধ হয় একটু মহুয়ার গন্ধ, কখনও বা আম্রমুকুলের গন্ধের আমেজ,--ইঙ্গিত মাত্র, এবং বাস্তবের চেয়ে ইঙ্গিতের মতই মন [illegible]। [illegible] কি যে [illegible]নে হয় ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না, [illegible]র নিজেকে আর চারিদিকের সব জিনিসকে বেশ ভাল লাগে—পুরান [illegible]ন্তু যেন নূতন রূপে দেখা দেয়।

চেঞ্জের সময় শেষ হইয়া আসিল আর ছুটি নাই। সেই কথাই [illegible]ইতেছিল। শীলা বলিতেছে "বেয়াক্কিলের মত কথা ব'ল না, পাহাড়ে শীতে হি-হি করে তিনটে মাস কাটিয়ে যেই শীতটা কাটব কাটব করছে, হুকুম হ'ল 'চল', আমি যাব না। আমি কারুর হুকুমের দাসী নই।"

পুলিন বলিল- "হুকুমের দাসের প্রতি কি আদেশ হয়? একাই যেতে, না চাকরি ছেড়ে এইখানে বসে থাকতে?"

"যাকে ছাড়াটা তাঁর পক্ষে সহজ তাকেই ছাড়ুন তিনি। চাকরি কেন ছাড়তে যাবেন? মোট কথা আমি যাব না এখন।"

জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

সামনে—অনেক দূরে একটা টানা পাহাড়ের কুঞ্চিত রেখা; ধূসর স[illegible]দ্য আকাশের গায়ে একটা নীল পর্দা যেন। তাহার পরই সমস্ত জায়গাটা [illegible]খেলান; কোথাও একটা পাহাড়ী নদীর বাঁক--বালুর উপর অস্তরবির [illegible] ঝিকমিক করিতেছে। একটা ঢিবির ওপর পাঁচ-ছয়টা পলাশ গাছ, [illegible]র দেওয়ালী জ্বালিয়াছে... ওরাঁওদের একটা ছোট দল—পুরুষেরা [illegible]য়েদের থেকে একটু আলাদা—মেয়েরা খানিকটা যায়, একসঙ্গে খুব মিহি-সুরের কি-একটা গানের কলি একবার গাহিয়াই ছাড়িয়া দেয়—উঁচুনিচু জমির গায়ে সুরের স্রোত যেন ধাক্কা খাইয়া ফেরে।.. পলাশ গাছের নিচে একটি যুবতী মেয়ে আর একটি যুবা একটু আটকাইয়া গেল—ফুলের দরকার পড়িয়াছে। দলের মধ্যে থেকে কয়েকজন ফিরিয়া দেখিল;—এদের দুজনকে লক্ষ্য করিয়া একটা কি আলোচনা হইতেছে—হাসি আছে বিদ্রূপও

আছে বলিয়া মনে হয় যেন।... ওরা পুষ্প সঞ্চয়েই ব্যস্ত — মেয়েটা সঙ্গিনীদের পানে একবার ঘুরিয়া দেখিয়া হাসিল — নিটোল কালো মুখের ওপর পড়ন্ত রোদের হালকা আবির পড়িল ছড়াইয়া।

শীলা একবার হঠাৎ ফিরিতেই দেখিল পুলিন ঠিক পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে; ঘরের মাঝখান থেকে কখন নিঃসাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। শীলার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই মৃদুস্বরে বলিল — "চমৎকার আছে ওরা দুটিতে।"

শীলার রাগ হইয়াছে, মুখ ঘুরাইয়া লইল। দম্পতির পানে নয় অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, রাগের সময় এমন কিছু দেখিতে চায় না যাহাতে রাগ জল হইয়া যাইতে পারে। হাল্কা হওয়ার মত অবস্থা নয় মনের।

সময় সময় রাগও একটা সম্পত্তি, মানুষ ভোগ করে, হাতছাড়া করিতে চায় না।

পুলিন মুগ্ধকণ্ঠে বলিল — "আমারই কি অসাধ শীলা থেকে যেতে? কি মনে হয় জানো?"

শীলা উত্তর না দিলেও বলিল — "মনে হয় বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে যদি ঐরকম ওরাঁও ছেলে হতাম একটা "

শীলা চুপ করিয়াই রহিল, দৃষ্টি পলাশতলায় অবাধ্যভাবেই আটকাইয়া গেছে। ছেলেটা একবার দূরগত সঙ্গীদের দিকে চাহিল, তাহারা একটা বাঁকের আড়ালে লুপ্ত হইয়া গেছে। বোধ হয় আর কেউ কোথাও আছে কি না নির্ণয় করিবার জন্য চারিদিকে একবার নজর বুলাইয়া লইয়া ছোট্ট পল্লবযুক্ত একটা ফুলের গুচ্ছ মেয়েটির এলো খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেছে। সে ঘাড় নিচু করিয়া প্রসাধন গ্রহণ করিতেছে। একটি অনবদ্য চিত্র।

নিজেকে আবার সচকিত করিয়া লইয়া শীলা বলিল — "যার ওরাঁও হবার সাধ হয় সে হোক, আমি হতে চাই না।"

পুলিন বলিল — "চাও বৈকি।"

"কখনও নয়; কে বললে?"

"তোমার মন বলছে, শীলা।"

"কক্ষণও নয়।"

পুলিন একটা হাত শীলার কাঁধের উপরে রাখিল। মুখটা একটু

ঝুঁকাইয়া হাসিয়া বলিল—"এবার বলত--'কক্‌খনো নয়'।"

এটা ওর একটা তুক্‌, সত্য কথা আদায় করিতে হইলে শীলাকে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে। জ্বালাতন হয় শীলা, কিন্তু সংস্কারটা কাটাইয়া মিথ্যা বলিতে পারে না। শাস্ত্রে স্বামী-দেবতাকে স্পর্শ করিয়া কোন রকম অসৎ খেয়ালই মনে করিতে মানা, মিথ্যা বলা তো দূরের কথা। কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জানালার বাহিরে অস্তরাগ আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়ে দুটিতে পাশাপাশি চলিয়াছে। অনেকটা পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া গতি ত্রস্ত। উচ্ছল কথাবার্তা চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে; দূর থেকে দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন আর মাটি মাড়াইয়া চলিতেছে না। ছেলেটা কোমরে গোঁজা বাঁশী তুলিয়া ধরিয়া একটা সুর তুলিল কিন্তু মেয়েটার কথার দিকেই ঝোঁক বেশি, সুরে বাধা পড়িতে লাগিল।

রাগের উপর এ-দৃশ্য দেখা দুর্বলতা, কিন্তু শীলা চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। পুলিন পাশের একটা ফুলদানি থেকে একটা মার্শেলনীল গোলাপ লইয়া শীলার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে দিতে আবার মুখের পানে ঝুঁকিয়া বলিল--"বল না শীলা, হয় না ইচ্ছে?..এই আমি এই রকম বুনো হয়ে যদি বনের ফুল গুঁজে দিই এলো খোঁপায়?"

শীলা কতকটা যেন অবশ হইয়াই স্বামীর গায়ে একটু এলাইয়া পড়িল, স্বামীর কথার সোজা উত্তর না দিয়া বলিল—"নাও না ছুটি গো একটু; সত্যি বলছি যেতে ইচ্ছে করছে না এ জায়গাটা ছেড়ে এখন।"

বাইরের বারান্দায় কাহার পায়ের খস্‌ খস্‌ আওয়াজ হইল। শীলা নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া আবার জানালায় ভর দিয়া দাঁড়াইল। পুলিনও গিয়া পাশে দাঁড়াইল। বলিল—"তুমি বলছ--দরখাস্ত দিয়ে দেব কাল; কিন্তু বৃথা, গতবারেই সায়েবের রিমার্ক ছিল আর কোনমতেই এক্সটেন্‌শন্‌ দেওয়া হবে না। আইবুড়োর মরণ—বোঝে না তো আমাদের দুঃখ।'

একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। খানিকটা চুপচাপের পর শীলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পুলিন তাহার মাথার ফুলটা আরও একটু বসাইয়া দিতে দিতে বলিল—"শীলা, সেই গানটা গাও, গাইবে?—সেই—'রঙের খেয়াল জাগল হঠাৎ বাতাসে'..."

বাইরের বারান্দায় ঝিয়ের পায়ের খস্‌খসানি শোনা গেল। শীলা বলিল —"হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, গান!... আমার লজ্জা করে বাপু। ঝি চাকর ঘুরছে..."

পুলিন বাঁ হাত দিয়া বধূকে আলগাভাবে জড়াইয়া ধরিল; বলিল — "শীলা, কতটুকু জীবন? তার মধ্যে কতটুকু বসন্ত, তাকে পাবার সুযোগ আরও কতটুকু আসে জীবনে? সংকোচের জায়গা নেই। দেখলে না?— পথ চলতে চলতে হঠাৎ ফুলের সন্ধান পেয়ে ওরা দল থেকে নিঃসংকোচে কেমন আলাদা হ'য়ে কোঁচড় বোঝাই করে নিলে? বেশ গুছিয়ে ব'সে জীবনকে উপভোগ করতে ক'জন পায় শীলা?—এইরকম চলতে চলতেই পথের ফুল কুড়িয়ে না নিলে আপশোষ থেকে যায়।...আস্তে আস্তেই গাও না।"

"না, আমার কেমন লজ্জা করছে।.. ওগো, একটা কথা জান? –ঝিটা আমাদের বড্ড দেখে বাপু। ক'বার আমার সন্দেহ হয়েছে; বলব বলব করে তোমায় বলা হয়নি।"

"কি আর এমন বে-আইনী কাজ করে শীলা? আমরা দেখবার যুগ্যি-- দুটিতে যখন একসঙ্গে হই, তখন আরও দেখবার যুগ্যি হই, দেখবে না?"

শীলা বিস্মিত হইয়া বলিল —"ওমা, তাই বলে হাঁ করে দেখবে ওরা? ভাল লাগে তোমার?"

"খুব ভাল লাগে। গাও তুমি।...শীলা শুনছ? বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে।"

শীলার মন অন্যদিকে ছিল, হঠাৎ ডাক দিয়া উঠিল —"ঝি!"

যেন মনে হইল কে পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দার ও-প্রান্তে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেইখান থেকেই ঝিয়ের গলায় উত্তর হইল —"আমায় ডাকছ দিদিমণি? আসি।"

বেহারী মেয়ে; কিন্তু অনেকদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে পুলিনদের বাড়িতে আছে, বেশ বাংলা বলিতে পারে, শীলার দেওয়া শাড়ি আংরাখা পরিয়া বাঙালীর মত থাকে। বাংলা গানও শিখিয়াছে, শীলার কাছে গায় কখনও কখনও।

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া শীলা মৃদু হাস্য

করিল। ঝি আসিলে প্রশ্ন করিল। "রামলগন কোথায়? আর সদানন্দ?"

ঝি একটু মুখ কুঁচকাইয়া বলিল—"এ বাবুকে তো দেখছি না সেই থেকে। একটু টহল দেওয়া রোগ আছে তো?... সদানন্দ রাঁধছে।"

ঝি যেখান থেকে সাড়া দিয়াছিল, প্রায় সেইখান থেকেই রামলগনের গলার আওয়াজ শোনা গেল—"না, হামি তো এই জগ্‌হতেই আছি, বহুৎক্ষণ থেকে।"

লোকটা বউয়ের ঠিক উল্টা,—বোকা, অলস, অপরিষ্কার। একটা কাঠের গুঁড়ি যেন, ঝি যেদিকে লইয়া চলে, গড়াইয়া গড়াইয়া যায়, ছাড়িয়া দিলেই নিশ্চল হইয়া পড়ে। যাকে গাড়োল বলা হয়, ঠিক সেই ধরণের লোক।

ঝি ওর কথায় একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—"কাজ আছে কোন দিদিমণি?"

"তেমন কিছু নয়। বলছিলাম তোরা দু'জনেই যে কোথায় থাকিস..."

ঝি চলিয়া গেলে শীলা স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"দেখলে তো? দুটোতেই ছিল, ও হারামজাদী বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে।... অন্যায় নয়? কি করছি না করছি, এই রকম আড়াল থেকে দেখবে?"

পুলিন হাসিয়া বলিল—"বসন্ত যদি অন্যায় না হয় তো এ-ও অন্যায় নয়। হাওয়াই আজ এইরকম যে শীলা। তখন ওরাঁও দু'টি থেকে আমরা কি চোখ ফেরাতে পেরেছিলাম—যখন ফুল গোঁজার সময় ছেলেটা খোঁজ নিচ্ছিল কেউ কোথাও দেখছে কি না?... নাও গাও দিকিন, লক্ষ্মীটি।"

শীলা তবুও চুপ করিয়া রহিল। আবার তাগাদায় ধীরে ধীরে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কি একটা যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী একটু কৌতুকের সহিতই হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি?"

কুণ্ঠিত উত্তর হইল—"না, আমায় মাফ কর, আমি গাইতে পারব না আজ।"

মুহূর্তমাত্র থামিয়া স্বামীর মুখের উপর লজ্জিত দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"একটা মজার ব্যাপার হয়েছে—অনেক দিন, অনে—ক দিন পরে।"

আবার মুহূর্তখানেক থামিয়া স্বামীর বিমূঢ় দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল—"শুধু ঝি নয়, আজ তোমার সামনেও আমার কেমন বড্ড লজ্জা লজ্জা করছে বাপু, আমি বলে ফেললাম মনের কথাটা, যাই মনে কর না কেন। কেন এমনটা হল কে জানে"—বলিয়াই নিতান্ত ছেলেমানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল শীলা। নিজের লজ্জারুণ মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ঢাকিয়া ফেলিল।

একটু গেল। পুলিন কি একটা অতিনিবিড় নেশায় যেন আবিষ্ট হইয়া গেছে। বাহিরের ফাগে আর মনের ফাগে একাকার হইয়া গেছে যেন। একি বিপর্যয়! চার বছর পরে হঠাৎ ফুলশয্যার রাত কোথা থেকে আসিয়া পড়িল শীলার চেতনায়—লজ্জায়, কুণ্ঠায় তাহাকে আবার নববধূ করিয়া দিয়া? পুলিন জানালার বাহিরে চাহিয়া কি একটু ভাবিল। চোখ দুইটি কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরিয়া গিয়া সে আবার বধূকে বামকরে বেষ্টন করিয়া কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"শীলা!"

উত্তর হইল না। পুলিন বলিল—"এ লজ্জার ওষুধ আমি জানি শীলা।"

শীলা মগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি?"

আবার সেই ঝিরঝিরে আতপ্ত হাওয়াটা একটু জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা মদির ভাব—যত রকম প্রগল্‌ভতায় মনটাকে যেন মাতাইয়া তোলে।

বধূর কপালে, কর্ণমূলে দুলিতেছে চূর্ণকুন্তল,—ফোটা ফুলের কেশরের মত। আস্তে আস্তে তুলিয়া দিতে দিতে পুলিন বলিল,—"ছোট লজ্জাকে সরাতে হলে খুব একটা বড় লজ্জার কাজ করতে হয়।"

শীলার মুখটা মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধ করপুটে একটু টান দিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"পারবে শীলা? আমার অনেক দিনের একটা সাধও।"

শীলা অঞ্জলির উপর দিয়াই কুণ্ঠিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল, কিছু না বুঝিয়াই দুষ্টামির সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল—"না।"

"পারতে হবে। আজ তুমি আমায় নতুনভাবে পেলে· তাই এই নতুন করে লজ্জা। আমিও তোমায় একটু নতুন করে পাই না কেন। রাজি?"

রাজি নয়, তবে কৌতূহলকে চাপিতে না পারিয়া শীলা হাতের অঞ্জলি আলগা করিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "ব্যাপারখানা কি?"

--মুখটা আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিন লজ্জিত মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "সেই গাউনটা (gown)।– প্যারিস থেকে তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। এক মে ডে'তে (May Day) কেনা; সেটা ওখানকার দোলের দিন। . এ তো আর আমাদের বাড়ি নয় যে লজ্জা . হ্যাঁ পর', লক্ষ্মীটি; তোমায় গাউন পরলে কেমন মানায় অনেক দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে আছে, আজ ঠিক যেন তার দিনও এসেছে।"

তাহার পর আবার কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল -- "ঝি আর চাকর ওদিকে আছে, আমরা দু'জনে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব, তারপর বেড়িয়ে এসে এই দিক দিয়েই আবার ঢুকে পড়ব বাড়িতে। সন্ধ্যেও হয়ে এল।"

শীলার চোখ দুটিও কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, টিপ্পনী করার মত করিয়া বলিল- "এক্ষুণি জ্যোৎস্না উঠবে ভরা জ্যোৎস্না।"

অর্থাৎ আজকের সন্ধ্যায় সুট, গাউন গোপন হইবার নয়।

ফল কিন্তু হইল উল্টা, বসন্তে এমনই হয় -- পুলিন আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল -- শীলার হাত দুইটা ধরিয়া বলিয়া উঠিল- "ঠিক শীলা, আজ আবার ভরা জ্যোৎস্না, সামনেই তো পূর্ণিমা।. পর', আমার দিব্যি। জ্যোৎস্নায় যা খুলবে ও-গাউন!– আর তোমার গায়ে . আমি যাচ্ছি বাইরে, এই চাবি রইল।...আজ কতদিন থেকে যে বাক্সয় ঘুরছে বেচারি! ..আমরা এই দিক দিয়েই বেরিয়ে যাব, চোখে পড়বে না কারুর..."

শীলাও কেমন যেন হইয়া গেছে; বহুদিনের প্রতিজ্ঞা হঠাৎ আজ শিথিল হইয়া গেল কেন? একি সর্বনাশা সব-বিলুবার ভাব আকাশে বাতাসে আজ?...হাসিয়া বলিল—"কি আদাড়ে শখ বাপু—যার জন্যে ঝি-চাকরের কাছেও চোর হওয়া!"

পর্নলিন বাহির হইতে দোরটা ভেজাইয়া দিতে দিতে বলিল—"মত বদলালে চলবে না, এসে দেখি যেন..."

শীলা হাসিয়া বলিল—"প্যারিসের একটি মেম সাহেব বসে আছে..." দরজাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

*

* *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরের কথা।

সন্ধ্যা কখন আসিয়া চলিয়া গেছে টের পাওয়া যায় নাই; একটু আবছায়া হইতে না হইতেই ত্রয়োদশীর চাঁদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, মনে হইল দিনের আলো রাতের জ্যোৎস্নায় যেন বিলীন হইয়া গেল।...আজ সব তাতেই কি রকম একটা গলাগলি, মাখামাখি কাণ্ড।...শুধু যে আলোয়-আলোয় তাই নয়;—হাওয়ায়, পাখীর সুরে, মহুয়ার গন্ধে, মনের বাসনায়, বাসনার তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে সব একসা হইয়া গেছে।

শীলার পায়ে হীল্‌তোলা জুতা, তাহার উপর হালকা গোলাপী রঙের স্কিনকলার মোজা, পরনে দুধের মত ধবধবে খুব দামী সিল্কের গাউন,—একটু খাট;—তাতে বয়সে সত্যিই ওকে যেন সেই ফুলশয্যা রাতের শীলাটি করিয়া দিয়াছে। হাতে একটা সিল্কের নানারকম ফুলবসান চমৎকার মেয়েলি টুপি।

পর্নলিনের আগে থাকিতেই বেড়াইবার জন্য সান্ধ্য সুট্‌ পরা ছিল। আর সুট্‌ই ওর আটপৌরে পোষাক।

কিন্তু বেড়াইতে যাওয়া হয় নাই। খোলা জানালার সামনে সোফাটা টানিয়া দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। বড় লজ্জা ছোট লজ্জাকে চাপা দিতে গিয়া নিজেই পায়ে পায়ে জড়াইয়া গেছে। সব করিয়া ধরিয়া শীলা একেবারে শেষ দিকে আসিয়া হঠাৎ অবুঝের মত জিদ ধরিয়া বসিয়াছে। জুতা, মোজা, গাউন পরিয়াছে, হাতে সোনার ব্যান্ড দেওয়া রিস্ট ওয়াচ বাঁধিয়াছে, পর্নলিনের আগ্রহে মুখে পাউডার রুজ্‌ পর্যন্ত বাদ দেয় নাই,

ফোটাফুলের গন্ধের মত তাহাকে ঘেরিয়া ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিসের পেলব গন্ধ গম্‌ গম্‌ করিতেছে, কিন্তু এর পরেই সে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছে -- টুপি মাথায় দিবে না, আর বেড়াইতে যাইবে না।

স্বামী মিনতি করিতেছে—"চল শীলা, বেড়িয়ে আসি—সব ঠিক ঠাক্‌ করে এ কি অদ্ভুত জিদ দেখ দেখি! কি দোষ এমন হবে টুপিটা পরলে আর বেড়িয়ে এলে?"

শীলা বলিল—"হবে।... কি দোষ এমন হবে টুপিটা না পরলে আর বেড়িয়ে না এলে?"

"সে তুমি বুঝলে আর ওকথা বলতে না। এ শুধু আমায় জ্বালান তোমার।"

"তোমার শখের পায়ে লজ্জা সরম সব জলাঞ্জলি দিই—সেটা মোটেই আমায় জ্বালান নয় তো!"

পুলিন যেন নিরুপায়ভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বোধ হয় বধূর লজ্জা দূর করিবার একটা উপায় হিসাবেই বলিল -"বেশ, একটা গান গাও; --সব তাতেই অবাধ্য হবে না নিশ্চয়?"

"বাপরে, তা পারি কখনও হতে! গুরুজন!"

--এক ঝলক হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া বলিল—"কিন্তু আমি প্যারিসের গান জানি না তো।...এই গাউন পরে..."

"তুমি বাংলা গানই গাও।"

"ওমা!--সে যে কাঁটা চামচ নিয়ে আলুভাতে খাওয়ার মত হবে!"

বলিয়া একেবারে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবার পুলিনের পালা। অভিমানভরে একটু ঘুরিয়া বসিল, বলিল—"থাক্‌, বোঝা গেল; যখন খুব বেশি পেতে চাই তোমায় তখনই বেশি করে দঙ্কাও তুমি আমায় শীলা। আজ নয়, এই চার বছর থেকে দেখে আসছি এই তোমার রীত। থাক্‌, আমার ঘাট হয়েছে।"

আরও একটু ভাল করিয়া ঘুরিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ গেল, তাহার পর শীলা স্বামীর পিঠের উপর আস্তে আস্তে লুটাইয়া পড়িল, তাহার বাহুতে গালটা চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"রাগ করলে?"

কোন উত্তর হইল না। শীলা বলিল—"অমনি রাগ হল বাবুর!... আচ্ছা চল, বেড়িয়ে আসি।...চল না?"

"না থাক্, কেউ দেখে ফেলবে তোমায় শেষে, সে লজ্জা আবার আমি কি করে সামলাব বল?"

শীলা গালটা স্বামীর বাহুতে আরও চাপিয়া বলিল—"এখনও রাগ গেল না পুরুষের, বাব্বাঃ!"

একটু থামিয়া বলিল—"আচ্ছা একটা উপায় বাৎলে দিচ্ছি, তাই কোরো, তাহ'লে আমার একেবারেই লজ্জার কারণ থাকবে না কোন।"

নূতন ধরণের কথা শুনিয়া স্বামী প্রশ্ন করিল—"কি উপায়টা শুনি?"

"কেউ যদি দেখে ফেলে তো ব'লো শীলা তো মরে গেছে। ও আমার প্যারিসের এক বান্ধবী এসেছিল, তাকেই নিয়ে আমি..."

স্বরটা হঠাৎ গাঢ় হইয়া আসিল।.. ভরা বসন্তেও কখন হঠাৎ একটু মেঘ করিয়া আসে, দু'ফোঁটা বৃষ্টি হয়,—কোথা দিয়া যে মেঘ আসে ঠিক বোঝা যায় না।

পুলিন নিজের দক্ষিণ বাহুর উপর বাঁ হাতটা বুলাইয়া দেখিল সেটা ভিজা।.. বড় ভুল হইয়া গিয়াছে; আজকের মত চমৎকার দিনে কেমন করিয়া এ ভুল করিল সে?.. কিন্তু বড় দেরীও হইয়া গিয়াছে যে। পুলিন অন্তরে অন্তরে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল বসন্তের এই দুর্লভ কয়টি মুহূর্ত—শীলার মন থেকে এই অশ্রুরেখাটুকু কি কোন মতেই মুছিয়া ফেলা যায় না?

কিন্তু বসন্তেরই মেঘ তো?—সে আঁধার লইয়া আসে না। হালকা বৃষ্টির পর স্বচ্ছ আকাশে আলো আরও বেশি করিয়া ওঠে ঝলমলিয়া।

শীলা মুখটা একবার ঘুরাইয়া স্বামীর অলক্ষিতে চোখ দুইটি মুছিয়া লইল, তাহার পর আবার স্বামীর গায়ে লতাইয়া পড়িল, বলিল—"এ আবার কি ভাব!"

পুলিন ফিরিয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল—"তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি শীলা।"

তাচ্ছিল্যের সহিত ভ্রূ নাচাইয়া শীলা বলিল—"এই কথা? তা স্বামী-দেবতারা আর কি করতে আছেন শুনি?"

- সঙ্গে সঙ্গেই হাসিয়া ফেলিল। পুলিনেব মনস্তাপেব ভাবটা কিন্তু কাটিল না বধূব পানে ঘুবিয়া মিনতিব স্ববে বলিল না সত্যিই আমায় মাফ কব শীলা আব গাউনটাও তুমি ছেড়ে ফেল।

না আমাব বেশ পছন্দ হয়েছে।

তবুও ছেড়ে ফেল।

কেন তুমি পববে

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। শীলা বলিল আশ্চর্য নয় আজ যেমন উদ্ভট শখ সব মাথায় ঢুকেছে!

পুলিন বলিল সত্যি কি যে চাই ঠিক করতে পারছি না শীলা বড় বেশি মন পেতে গিয়ে চারিদিকে যেন ঠোক্কব খেয়ে মবছি।

জ্যোৎস্না আবও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চোখ গেল'! চোখ গেল!! চোখ গেল!!! কবিয়া একটা পাপিয়া আকাশ বাতাস উচ্চকিত কবিয়া তুলিয়াছে। চোখ ঝলসান বূপই বটে আজকেব বাতেব!

বাবান্দাব দিকেব দবজা কে যেন খুব সন্তর্পণে অল্প একটু ফাঁক কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে। পুলিন প্রশ্ন কবিল কে

শীলা স্বামীব কাঁধে মাথাটি চাপিয়া যেমন ছিল তেমনি ঢুলিয়া বহিল। কে দেখিল না দেখিল আব হদিস নাই। স্বামীব প্রশ্নেও সাড় হইল না।

একটু পবে খুব ধীবে ধীবে—যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে প্রশ্ন কবিল একটা কথা বলি?

বল।'

'চল বেড়িয়ে আসি।

স্বামী স্ত্রীব মাথাটি নিজেব কাধে একটু চাপিয়া ধবিয়া বলিল এ তো আমাবই কথা শীলা।

তোমাবই শীলা অন্যেব কথা সে কোথায় পাবে? আমি গাউনটাও ছাড়ি।

'খুব লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে শীলা তুমি হ্যাঁ ছেড়ে ফেল।

আব তুমি ঐ সুটটা ছাড়।

পুলিন অতিমাত্র বিস্ময়ে ঘাড়টি একেবাবে ফিবাইয়া স্ত্রীর পানে

চাহিল,--সত্যই কোটপ্যাণ্ট ছাড়িতে বলে, না, মস্‌কবা? বিদ্রূপেব কোন চিহ্নই কোথাও নাই দেখিযা একটু কিন্তু হইযা বলিল—"আমার স্যুট্‌টা থাক্‌ না, কি আব ক্ষতি কবছে? কাপড়ে একটা কি রকম অস্বস্তি হয, ক্রমান্বযে চাব বছব ওদেশে থেকে কেমন একটা অব্যেস হযে গেছে "

নাকেব উপব ধাক্কা লাগিযা রামলগন পড়িতে পড়িতে
কোন বকমে সামলাইযা লইল

"তব্‌, কাপড়ই পব, কাপড়, পাঞ্জাবি আব চাদব।"

'শীলা, লক্ষ্মীটি, দোহাই। অবশ্য স্বীকাব কর্বাছ একটা বদ অব্যেস, কিন্তু স্যুট্‌টা ছাড়লে যেন মনে হয..."

"তা হোক, কাপড়ই পরতে হবে, অন্তত আজকের রাত্তিরে। আমি বের করে দিই।"

"নাঃ, তুমি ভয়ানক অবাধ্য হয়েছ শীলা। এরকম দ্'টি দেখা যায় না।"

দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিবে, নাকের উপর ধাক্কা লাগিয়া রামলগন পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইল। সামনের থামে হেলিয়া, নাকের উপর হাত দিয়া, পুলিনের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পুলিন বিস্ময়ে, রাগে মুখ গম্ভীর করিয়া প্রশ্ন করিল--"তুই এখানে কি করছিলি রে?"

রামলগনের মুখটা শুধু হাঁ হইয়া গেল, কোন উত্তর বাহির হইল না।

ঝি বারান্দার ও-কোণ থেকে আগাইয়া আসিল, যেন ওই দিকেই এতক্ষণ ছিল সে। পারৎপক্ষে প্রভুর সঙ্গে কথা কয় না। কাছাকাছি আসিয়া ঘরের মধ্যে শীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ওকে জিগ্যেস করতে পাঠিয়েছিলাম দিদিমণি বাবুর খাবার দেওয়া হবে?—সদানন্দ জিগ্যেস করছিল।"

বানান কথা, কিন্তু সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও ঝিয়ের কথাতেই সায় দিত। আর কথা না বাড়াইয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূরে একজন পরিচিত চেঞ্জারের নাম করিয়া বলিয়া গেল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

*

* *

বসন্তের নৈশবিহার চলিয়াছে, এক মুহূর্তেই এরা যেন কোথা থেকে কোথায় আসিয়া গেল। জানালার মধ্য দিয়া সে হাওয়া আর চাঁদিনি অল্প অল্প করিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের দু'জনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কাছেপিঠে কোথায় একটা নেবুগাছে ফুল ধরিয়াছে, মিষ্ট গন্ধে বাতাসটা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় উঁচুনিচু জমির উপর আলোছায়ার মায়া বিছান। বহুদূরে ওরাঁও পল্লী থেকে বাঁশীর মেঠো

সুর ভাসিয়া আসিতেছে, কেমন যেন মনে হইতেছে—সেই ছেলেটার বাঁশী: বিরামহীন চলার পথে তাহারা দুটিতে অফুরন্ত সুরের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—মনে হইতেছে এই সুরটুকুই শুধু জাগ্রত, আর সব চরাচরই এর যাদুস্পর্শে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সামনেই জমিটা খানিকটা গড়াইয়া গিয়াছে: শীলা অযথাই হাসিতে হাসিতে একটা কলোচ্ছ্বসিত পাহাড়ী ঝরণার মত তর্ তর্ করিয়া নামিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া বলিল - ওমা, তুমি এখনও ওপরে দাঁড়িয়ে! কি কুঁড়ে মনিষ্যি বাবু! —নেমে এসো; এসো না গো!"

পুলিন বলিল—"তুমি একটু থামো। একটা জিনিস নিয়ে আসি, মনে পড়ে গেল।"

"কি?"

"শোন বলি।"

"ঐখান থেকে বলা যায় না?"

"কাছে এসে শুনলে দোষ আছে? খেয়ে ফেলব আমি?"

"পারো, আজ তোমায় বিশ্বাস নেই।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুলিনও মৃদু হাস্যের সহিত যোগ দিল, নামিতে নামিতে বলিল—"আচ্ছা, আমিই নেমে বলছি, গরজ একলা আমারই নিশ্চয় —বলছিলাম—তোমার হঠাৎ ফুলশয্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল না? - আজ তারই ব্যবস্থা করতে হবে – এবারে ঐ পাহাড়ী নদীর বালুচরে। তাই "

শীলা কপট বিস্ময়ে ভ্রূ কপালে তুলিয়া বলিল "তাই বুঝি বাড়ি থেকে ঐ বীরভদ্দর পালংটা মাথায় করে নিয়ে আসতে যাচ্ছ?" বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল।

পুলিন বলিল "আঃ, জ্বালিও না শীলা, চল তুমিও, কোঁচড় ভরে ফুল নিয়ে আসতে হবে বাগান থেকে"—

"বলিহারি শখ" বলিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে শীলা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

স্বামীর পানে লজ্জিত হাস্যের সঙ্গে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"বলব?"

পুলিন সকৌতুকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আবার কি?"

"ও ফুল চাই না।"

"তবে?"

শীলা সেইভাবেই চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

--একটু পরে বলিল - "হাসতে পাবে না বাপু, তা বলে রাখছি।"

"আজ তোমার কাণ্ড দেখে হাসি আর আসছে না আমার।"

শীলা হঠাৎ ফিরিয়া পা বাড়াইল, বলিল---"এস, ফের।"

পুলিন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল "ফের মানে?--আনবে না ফুল?"

শীলা লজ্জার ভয়ে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল না; আব্দারের ভঙ্গিতে গলাটা দুলাইয়া সামনে চাহিয়াই বলিল "বাগানের ফুলে হবে না আজ, আমার সেই পলাশ ফুল চাই - সেই ছেলে আর মেয়েটা যার তলায়.."

শেষ না করিয়া একবার মুখটা ঘুরাইয়া বলিল— "কই, এস—বাঃ!..."

ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল।

সদানন্দ বারান্দার সিঁড়িতে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, দূর থেকে এদের দেখিয়া হন্তদন্ত হইয়া আগাইয়া আসিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া দুইজনেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"কি ব্যাপার সদানন্দ?"

সদানন্দ পাচক ব্রাহ্মণ বাঁকুড়ার ওদিকে কোথায় বাড়ি। বলিল-- "সব্বনাশটি হোল বটেক্ বাবুমশয়! আপনকার ঘরে সাহেব আর মেম দেখি!!"

"আমার ঘরে সায়েব আর মেম! তোমরা কোথায় ছিলে? রামলগন আর ঝি কোথায়?"

সদানন্দ হাত উল্টাইয়া বলিল —"উ দুটিতে তো পলায়ে গেল বটেক্। আমি পাক করে একটু বাইরে যাওয়া করেছিলাম, এসে দেখি আপনকার ঘরে অরা দু'জন, রামলগনটির আর ঝিটির দেখ্যা নাই বটেক্।"

স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। শীলা বলিল - "মিশনের সেই পাদ্রী সাহেব আসেনি তো?..কিন্তু এরা দু'জনে কোথায় গেল? পালাবার কি আছে?"

সদানন্দের কাছে টের পাওয়া গেল তারা দু'জনে নিশ্চয়ই ভয়ে পলাইয়াছে, কেননা, সাহেব-মেম দু'জনেই পাগল, ঘরে আলো নিভাইয়া চুপ

করিয়া বসিয়া আছে। স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে সদানন্দের পাশের গ্রামের একটি মেয়েছেলে রাঁধুনীগিরি করে। বাবুর আসিতে দেরী হইবে জানিয়া তার সঙ্গে সদানন্দ দেখা করিতে গিযাছিল। বাড়ি যাইতেছে, কোন যদি তত্ত্বতাবাস থাকে। ফিবিয়া দেখে এই কাণ্ড! সাহেব-মেম অবশ্য এখন খুব ঠাণ্ডা হইয়া বসিযা আছে, কিন্তু সদানন্দের অবর্তমানে গুরুতর রকমের

'সব্বনাশটি হোল বটেক, বাবুমশয়।'

হৈ চৈ বা একটা কিছু করিয়াছিল, তাহা না হইলে উহারা দু'জনে পলাইবেই বা কেন?

শীলা স্বামীর পাশে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি হবে গো? আমার পাগলকে বড্ড ভয় করে। হ্যাঁগা, সায়েবরা আবার পাগল হতে আরম্ভ করলে কবে থেকে? বেশ তো ছিল..."

সদানন্দ "গান্ধী মহাবাজ ঘবে থেকে ' বলিযা কি একটা বলিতে যাইতেছিল। পুলিন তাহাকে প্রশ্ন কবিল—"তুমি দেখেছ ওবা কোথাও আছে কিনা? পাশের বাড়িগুলোতে দেখেছ?"

সদানন্দ জানাইল সে বাড়ি ছাড়িযা নড়িবে কি কবিযা? তবে সব ঘব পা টিপিযা টিপিযা তন্ন তন্ন করিযা খুঁজিযাছে, ওদেব দু'জনেব কেহ নাই।

প্রশ্ন হইল—'সাহেবকে জিগ্যেস কবতে পাবতে তো?—কোথা থেকে এসেছে—কেন "

সদানন্দ হাত দুইটা একটু তুলিযা এমনভাবে শিহবিযা উঠিল যেন পুলিনকেও একজন পাগল ঠাহব কবিযাছে একটি কথায তাহাব সমস্ত ভয এবং বিস্মষ জড় কবিযা বলিল—'বাবুমশয!!'

পুলিন বিবক্তভাবে বলিল—'চল দেখি। হতেও পাবে পাগল। বাবুবা সব টহল দিতে গেছেন, সুবিধে বুঝে ঢুকে ব'সে আছে। আজ কাল আবাব নেশা কবে নানা বকম সং সেজেও তো প্রায আধা পাগল হযে বযেছে সব দোলেব হিড়িকে। পড়েছে ঢুকে তাদেব মধ্যে কেউ। আমাব কথা এবে বাখো—এদেব আসবাব আগেই সে হাবামজাদী ঐ ইডিযাট্‌টাকে নিযে জ্যোচ্ছনায হাওযা খেতে গেছে—মনিবদেব নকল কবা চাই তো? তুমিও বেটীব মাথা খেয়ে দিযেছ বাঙালী কবে দিযে। শখ কবে একটু যে মানে নেহাৎ জবুবি কাজেও লোকে যে একদণ্ড এদেব হাতে বাড়ি ছেড়ে যাবে '

শীলা বলিল— হ্যাঁগা সত্যি পাগল হতেও পাবে যে বলছ—দুজনেই পাগল হবে? কি পাগলা হাওযা উঠেছে বাপু!

পুলিনেব মেজাজটা খিঁচড়াইযা গিযাছে বিবক্তভাবেই বলিল- না হলে একজন আলো নিবোলে আব একজন জেলে দিতে পাবত না? কী যে ছেলেমানুষেব মত বকো! তমি যেন আবও মাথা গুলিযে দিচ্ছ চল দেখি তুমি না হয দাঁড়াও এখানটায।

না একলা আমাব ভয কববে। একি বেযাক্কেলে পাগল বলতো ঘবে ঢুকে বসে থাকা যাদেব ঘব তাবা বাইবে হাঁ কবে থাকুক! ওগো আস্তে —অত গোঁযার্তুমি নয—এখন আবাব ওবা কি কবছে, কে জানে হাতে যদি একটা নিযেই বসে থাকে! না বাপু এ বীবপুরুষকে নিযে আর পাবা গেল না! "

ইহারা বারান্দায় উঠিল। শীলা একটু পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল পা চালাইয়া স্বামীর পার্শটিতে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক কথাই—উঠানের ওদিকে তাহাদের ঘরে আলো নিভান, জানালার সামনে সোফাটায় একরাশি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, মুখ দেখা না গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে সোফার উপর একজন সাহেব আর একজন মেম, দুইজনেই ওদিকে মুখ করিয়া। সাহেব সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া আছে, হাতে একটা পাইপ। টানিবার আর ধুঁয়া ছাড়িবার বহর দেখিয়া আর সন্দেহ থাকে না যে, জবরদস্ত পাগল। থাকিয়া থাকিয়া এক একটা সাহেবী গলাখাঁখারি দিয়া উঠিতেছে। মেমসাহেব তাহার একটা উরুকে বালিস করিয়া জানালার পানে চাহিয়া উল বুনিতেছে। একবার উঠিল মনে হইল যেন সাহেবের হেলান দেওয়ার ভঙ্গিটা ঠিক করিয়া দিল, তাহার পর আবার বেশ যুৎ করিয়া তাহার জানুতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

শীলা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—"কিছু বুঝতে পারছ?"

স্বামীর পিঠে হাত দিয়া আরও সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হ্যাগা, ভূত নয় তো? লোক ডাকবে?"

তিনজনেই চমকাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার লজ্জিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, সাহেব আর মেমসাহেব হঠাৎ গলাখাঁখারি দিয়াছে। পরক্ষণেই যেন মনে হইল গুন গুন করিয়া গান আরম্ভ হইল। ঘরটা উঠানের ওধারে মেমসাহেবী গলার আওয়াজ খুব মিহি হইয়া আসিতেছে।

এরা তিনজনে একেবারে কাঠের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে ঢুকিয়া আলো নিভাইয়া গান গায়—এ-পাগলামির অভিনবত্ব আছে। গুন গুনানি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহার পর স্পষ্ট গান শীলার বিস্ময়ের অন্ত নাই। স্বামীর জামার হাতাটা চাপিয়া ধরিয়া কি বলিতে যাইবে এমন সময় সাহেব পর্যন্ত মুখ থেকে পাইপ সরাইয়া সরাসরি গান করিয়া উঠিল। গুনগুনানির দিক দিয়াও নয়। দোলের দিন ছাপরেয়ে বা ভোজপুরীদের কণ্ঠে যেমন শোনা যায়,—সেই গান সেই সুর, সেই ভঙ্গি—

ওহো, ফাগুনাকে রাতিযামে পিয়া
কাঁহ্মা হো—
ফাগুনাকে রাতিযামে পিয়ারা—আ—আ—আঃ .

সদানন্দ বাহিরের বারান্দায় সিঁড়িতে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। বাসা থেকে খানিকটা দূরে একটা ঢিবির উপর স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া আছে। ওদিকে এদের ঘরে রামলগনের গলা আরও জোর হইয়া উঠিতেছে—

ওহো, চুন্‌রি রঙা দি'হে লালে লাল হো—
ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়াবা—আ—আঃ...

*   *   *

হাসিয়া লুট্‌পুট্ খাইতে খাইতে শীলা একবার হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; বলিল—"না বাপু, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আমার গাউনটা বড্ড পছন্দ হয়েছিল, হারামজাদীকে ঝাঁটা মেরে কাল বিদেয় করব। অমন দামী, অমন চমৎকার গাউনটা!...মুয়ে আগুন!...আর, আমরা যে এসে পড়তে পারি, সে-হিসেবও নেই তো!"

স্বামী বধূকে বাম করে আবেষ্টিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—"চারিদিকে এত বে-হিসাবের ছড়াছড়ির মধ্যে তুমি এই সামান্য গাউনের হিসেবটা ধরে বসে আছ শীলা? ফাগুন আহুতি চাইছে শীলা,—কেউ দিচ্ছে লজ্জা-সংকোচ, ওরা দিয়েছে ছোটবড়র—মনিব-চাকরে ভেদাভেদ জ্ঞানটা, আমাদের দিতে হল আমাদের সজ্জা—তা ভাল মনেই দিয়ে দিই না কেন?"

উমেশকো বোহীন

ট্রেনে কোথাও যাইতে হইলে আমি উঠিয়া প্রথমেই একটা বাঙ্ক্ দখল করিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া লই। চমৎকার জায়গা। একটু বোধ হয় কোণঠাসা হওয়া গোছের হয়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করিবার এমনটি জায়গা আর কুত্রাপি নাই। অথচ নিজে নির্লিপ্ত—একটি নিশ্চিন্ত দূরত্বে থাকিয়া দিব্য কৌতুক দেখা। কতকটা—যেমন শোনা যায়—ভগবানের মত। সংসারযাত্রীরা যাত্রাপথের ক্ষণিক দেখা-শোনার মধ্যেই সামান্য একটু সুবিধা অসুবিধা লইয়া প্রলয়কাণ্ড করিয়া তুলিতেছে,—কিংবা যদি ভাবের দিকেই ঝোঁক পড়িল তো এমন গলায় গলায় হইয়া পড়িতেছে যেন অনন্তকালের মধ্যেও আর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। তিনি (যেমন শোনা যায়) উপরে বসিয়া তামাসা দেখিতেছেন;—প্রলয়েও নির্লিপ্ত, নির্বিকার, প্রহসনেও তেমনই নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

আমি আছি বাঙ্কের উপর। নিচের সমস্ত বেঞ্চগুলি জোড়া, তবে ভিড় নাই, একটি বেঞ্চে খালি দুইজন, বাকি সবগুলিতেই এক এক জন করিয়া যাত্রী। মোটের উপর বেশ আরামেই চলিয়াছি। রাত্রির গাড়ি, প্রায় সাড়ে-নয়টা হইয়াছে, আহারাদি করিয়া সবাই শুইবার আয়োজন করিতেছে। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে।

বক্তিয়ারপুর স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। একটি মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক—"ওগো এদিকে, এই গাড়ি খালি আছে"—বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া আবার তখনই—"কই, কোথায় গেলে গো? ও উমেশ!" বলিতে বলিতে তখনই সজোরে দরজাটা বন্ধ করিয়া নামিয়া গেলেন। একটি বেহারী ভদ্রলোক বিছানা পাতিতে পাতিতে বলিয়া উঠিল—"ভলা হো বংগালী বাবুকা। ময় তো ডর গয়া থা—সাথ মে 'ওগো' ভি থি উনকি।"

সঙ্গী একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কেঁও, 'ওগো'-সে কেয়া ডর?"

ভদ্রলোক শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"আরে বাপ! 'ওগো' আনেসে উনকে সাথ হাঁড়িয়া, থালি, বকসা, বিছৌনা, বচ্চোঁকা মুসহরি,—ইয়ানে,

সারা দুনিয়া আ পহুঁছেগা। অওর কম সে কম চার পাঁচ লড়কা লড়কী তো জরুর হি; ভগবান মুঝে 'ওগো'-সে বচাবে'।"

একটু মৃদু হাসি উঠিল। কিন্তু সেটুকু মিলাইতে না মিলাইতে ভদ্রলোক আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"উমেশ, তুমি আগে ওঠো; যাও।...হ্যাঁ, এবার তুমি ওঠো... আমি বলি উঠেছো বুঝি সব আমার পেছনে, ওমা! ফিরে দেখি কা কস্য...!"

উমেশ বলিল—"আমি ভাবলাম..."

"আচ্ছা, এর পরে ভেবো'খন, নিশ্চিন্দি হয়ে।...অনাথ ওঠ...ওগো তুমি খোকাটাকে নিয়েছো, না, কোয়ার্টারেই পড়ে আছে সেটা, তোমরা তাও পার।"

গৃহিণী ফিরিয়া আধা ঘোমটার মধ্যে নাসিকা কুঞ্চনের সঙ্গে আঁচলে ঢাকা একটি পাঁচ-ছয় মাসের শিশুকে দেখাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"আর ওর দোলনাটা?...এই দেখ কান্ড! অনাথ তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?—নে, ওঠ শীগগির... বাণী কোথায়?"

একটি বছর আষ্টেকের ছোট মেয়ে হাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নে ওঠ্, দেখ কান্ড!"

উমেশ বলিল—"আপনি একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ান, উঠবে কি করে ওরা।"

ভদ্রলোক কয়েক ইঞ্চি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালে একটি মানুষ কি মালপত্র ওপরে উঠবে না।... মীনু কোথায়?"

মীনু মায়ের নিকট হইতে উত্তর দিল—"এইযে বাবা, আমি।"

ভদ্রলোক চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"তুই ওপরে উঠে গেছিস্? আর আমি এখানে 'মীনু মীনু' করে...তোরা ঠিক হিসেবে ভুল করিয়ে একটা কান্ড করবি...অনাথ হোল—মীনু হোল—খোকোন হোল...লুটরু কোথায়?..."

অনাথ বলিল—"লুটরু মার কাছে।"

ভদ্রলোক বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ত্রস্তভাবে মুখটা ঘুরাইয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওর মায়ের কাছে!... রামখেলানের কোলে ছিল না?...তোমরা আমায় ঠিক দয়ে মজাবে।...কে উঠল, কে না উঠল কিচ্ছু আন্দাজ পেতে দেবে না আমায়; মোটবহর একটিও ওঠেনি এখনও... ওদিকে স্টার্টার দিয়েছে... রামখেলান!"

বাঙ্কের উপর হইতে তামাসা দেখিতেছি। বেহারী ভদ্রলোকেরা

একেবারে থ হইয়া গিয়াছে। 'ওগো'--আশঙ্কী ভদ্রলোকটি একেবারে যেন অভিভূত হইয়া গিয়াছে। রামখেলান গাড়ির মধ্যে; মাঝে মাঝে এক একটা ভিড়ের ধাক্কা পহুঁছিতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া সে জানালা গলাইয়া জিনিস-পত্র কুলির নিকট হইতে লইয়া গাড়িতে জড় করিতেছে। বোধ হয় মনিবকে ভাল রকম চেনে বলিয়া উত্তর দিল না।

এদিকে উমেশ পাচক বামনের সাহায্যে দরজা দিয়া জিনিসপত্র তুলিতে-ছিল। বলিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না। উঠে এসে বসুন। জিনিসপত্র প্রায় সব উঠে গেছে; আমি গার্ড সায়েবকে বলে দিয়েছি, ছাড়বে না গাড়ি।"

ভদ্রলোক দোরের সামনের এবং ওদিকে রামখেলানের নিকট জড় করা লগেজের স্তূপের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাশভাবে বলিলেন –"সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল; আমি জানি—একটি জিনিস হিসেব মত ওঠেনি – কাল থেকেই তোমার আর তোমার বোনের যে রকম গড়িমসি—আমি জানি ঠিক এইটি ঘটবে… যা ইচ্ছে তোমাদের কর,—গার্ড সায়েব বোনাই তোমার, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে।"

আধা ঘোমটার মধ্য হইতে দাঁতে পেষা অস্ফুট শব্দ হইল—"মুখে আগুন!"

ভদ্রলোক আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া শিথিল চরণে উঠিয়া আসিয়া একটি বেহারী ভদ্রলোকের পায়ের উপর প্রায় মণ দুয়েকের চাপ দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উমেশ মোটপত্র সব উঠাইয়া রামখেলান আর পাচকের সাহায্যে উপরে নিচে গুছাইয়া রাখিল। যে ভদ্রলোকটির 'ওগো'-ভীতি সবচেয়ে বেশি প্রবল, গৃহিণী আসিয়া তাহারই বেঞ্চের কাছটিতে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। নিরুপায় ভদ্রতার খাতিরে তিনি নিজের বিছানা গুটাইয়া অপর দিকে চলিয়া গেলেন। উমেশ একটা গাঁঠরি খুলিয়া একটা বিছানা পাতিয়া দিল। "নাও, তোমরা বস দিদি, আপনিও আসুন বাঁড়ুয্যে মশাই এই দিকটায়।… কুলকুচির হাঁড়িটা নিয়ে তেরটা আইটেম্ আছে, কুঁজো চারটেকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছি; বঁটি, চাকি-বেলানগুলো বেতের ঝুড়িটার মধ্যে আছে, মাদুরটা…"

ভদ্রলোক বলিলেন—"মানুষ সব উঠেছে?… কুলকুচি পড়ে থাকবে না,

তা আমি জানি—তোমার দিদি আমায় ফেলে যেতে পারে; কিন্তু কুলকুচিও পড়ে থাকতে দেবে না, তেঁতুলও পড়ে থাকতে দেবে না; বলি মানুষ সব উঠেছে?"

উমেশ বলিল—"দিদি, দিদির কোলে খোকন—লুটরু—অনাথ—মীনু—বাণী..."

ভদ্রলোক আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন—"সাতজন যা'বার কথা নয়?"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। উমেশ নামিতে নামিতে হাসিয়া বলিল—"আর আপনি কোথায় গেলেন? মানুষের বাইরে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিচের বেঞ্চ হইতে আবার দাঁতে পেসা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন, ভীমরতি হয়েছে!"

বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই ভদ্রলোক গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"চিঠির উত্তর দিও।"

একটু দূরে হইতে আওয়াজ ভাসিয়া আসিল—"স্কুল বন্ধ হ'লে কুমু আর রাজেনকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন!"

আপনি আপনিই যেন আমার সেই বেহারী ভদ্রলোকটির দিকে নজর পড়িয়া গেল। ডান হাতের পাঁচটি এবং বাঁ হাতের দুইটি অঙ্গুলী একটু সঙ্গোপনে তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গীকে কি একটা ইসারা করিতেছে। বোধ হয় এই যে আপাতত সাতটির খবর পাওয়া গেল।

আমার বাঙ্কের নিচে যে বেঞ্চিটি, গৃহিণী ছেলে-মেয়েগুলিকে লইয়া সেটাতে বসিলেন। কর্তা তাহার পরেই মাঝের বেঞ্চটিতে বসিয়া। যে ভদ্রলোকটির পায়ের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে; উঠিয়া বসিয়াছেন। ডান হাত দিয়া ডান পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে মর্দিত করিতেছিলেন, কর্তা বাঙালী হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন—"আঘাত লাগা হ্যায়?"

ভদ্রলোক নরম প্রকৃতির মানুষ, পায়ের গোছ হইতে হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"নেহি, কুছ্ চোট নেহি হ্যায়।"

কর্তা বলিলেন—"থোড়া ব্যতিব্যস্তো কর দিয়া থা। কাচ্চা-বাচ্চা সাথমে রহনেসে মগজ ঠিক নেহি রহতা হ্যায়।"...

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—"জি হাঁ, ফিকির তো লগা রহতা হ্যায়।"

কর্তা বলিলেন—"আরও কারণ হুয়া হ্যায়—হামকো কোভি কোন ঝক্কি নহি লেনে দেতা হ্যায় উসবকা মাদার। আর উয়ো সর্বাভি হামেসা মা-কোই পাশমে রহতা হ্যায়, বাপ বোল করকে যে একঠো বস্তু হ্যায়..."

কচি ছেলেটা অত্যন্ত কাঁদিতেছিল, তাহার উপরের ছোট মেয়েটি "মামা কাছে যাবো" বলিয়া বায়না ধরিয়া সুরটা ক্রমে ক্রমে সপ্তমের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্কের নিচে চাপা, কিন্তু সুস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম—"অনাথ, জিগ্যেস কর দিকিন কানের মাথা খেয়ে বসে আছে? একটা মানুষ ক'টাকে সামলাতে পারে?...মুয়ে আগুন!"

ভাষা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, বলার সুর হইতে বোধ হয় মানেটা আন্দাজ করিয়া বেহারী ভদ্রলোক বলিলেন—খোঁখী কো আপ ইধর

'এই যে তোমার মামা রয়েছেন'

বোলা লিজিয়ে বাবুজী। উস্ বেঞ্চমে জগহ্ ভি নেহি হ্যায়, তকলিফ্ হোতা হ্যায়। এশো খুখুমণি তোমি হামাদের কাছে।"

খুকী ফিরিয়া চাহিয়া শঙ্কিত ভাবে মায়ের কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিল। কর্তা উঠিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। বলিলেন—"ভয় কি খুকু!—এই তো তোমার মামা রয়েছেন। ও'-মামার

চেয়ে কত্তো ভাল—কেমন আরও ফরসা… ভয় কি?"

খুব সাদা মনেই বলা, কিন্তু ওপর হইতে দেখিতেছি বেহারী ভদ্রলোকের মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অন্য বেহারী ভদ্রলোক কয়টিও একবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিল। যখন সাক্ষাৎ ভাগনের মায়ের ভাই তখন নিরুপায়ভাবে সহ্য করিতেই হয়, না হইলে এদেশে মামা কথাটাকে গালাগালের মধ্যে ধরে।…

ভুলাইবার খুব একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছেন ভাবিয়া কর্তা সাদাপ্রাণে বলিয়া যাইতেছেন—"যাবে মামুর কাছে…যাও না…মামী কত…"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য খুকীর মুখটা হাতের চেটোয় তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বড়ী খুবসুরৎ হ্যায়।"

এমন কিছু সুন্দর নয় খুকী; কিন্তু কর্তা সহানুভূতিতে গলিয়াই ছিলেন, আরও তরল হইয়া গেলেন। বাঙালী একটু বেশিরকম তরলিত হইলে প্রথম সুযোগেই বৌ বা তৎসঙ্গীয় কথা আনিয়া ফেলে। স্মিতবদনে মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া পিঠে দুইবার হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ওতো হোনেই পড়েগা, উসকা মামার বাড়ির তরফকা সবকোই অত্যন্ত সুন্দর হ্যায়। উসকো সেজো মামাকো তো দেখা?"

বেহারী ভদ্রলোকটি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির, তাহা না হইলে "মামা" হইয়াও এমন নিরুপায়-ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতেন না, বলিলেন—"যো বাবু উঠানে আঁয়ে থে‌ং?"

কর্তা বলিলেন—"ওই বাবু। কেসা দেখা? নেই, হামকো সম্বন্ধী বোলকেই নেই বোলতা হ্যায়। উসি মাফিক চেহারা…"

একটা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন!"

ভদ্রলোক বলিলেন—"জি হাঁ, দেখনেমে তো আচ্ছা হ্যাঁয়।"

বিশেষণটি সাধারণ,—কর্তা বেশ ক্ষুণ্ণ হইলেন একটু, খানিকটা উদ্দীপিত ভাবেই বলিলেন—"আপ হামকো অবাক্ কর দিয়া। হাজার মে উস্‌মাফিক অ্যাকটা চেহারা দেখাইয়ে তো। তব আপকো সুরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা দেখতা হ্যায়। হাম তো উমেশকোই দেখ করকে বিবাহ কিয়া,—বিবাহ বুঝতে হে‌ং তো?—সাদি।"

মাঝের দ্বিতীয় বেঞ্চের ভদ্রলোক দুইটিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন

এবং কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"উমেশ বাবুকো দেখ্‌কর সাদি ক্যায়সে কিয়া বাবুজী?"

শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া কর্তা বোধ হয় খুশী হইলেন একটু ঘুরিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তব্‌ দেখতা হ্যায আপকো সব ব্যাপার খোল করকে বোলনে হোগা। মানে, হামারা বুঢ়াবর জিদ থা বিবাহ করেগা তো আপোন চোখসে দেখ করকে করেগা, নেইতো কেইসে জানেগা যে শ্বশুর মশাই বোবা খোঁড়া কি অন্ধো একঠো গলামে লটকায়ে দেতা হ্যায কি নেহি? অনেক সম্বন্ধ আয়া অনেক গেয়া হাম জীবনমরণ পণ করকে জিদ ধরকে বৈঠা হ্যায যোভি কোই সম্বন্ধ আতা হ্যায শর্ম্মা যা করকে চক্ষু কর্ণকা বিবাদ ভঞ্জন করকে আতা হ্যায, কিসীভি পাত্রী ধোপে টিকতা নেহি হ্যায। অবশেষে এই উমেশকো বোহীন কা সাথ বিবাহ কা বাৎ লে করকে উমেশকো বাপ উমেশকো সাথমে লে করকে উপস্থিত হুয়া। হামারা বাবুজী উস বখত জীবিত থা হামারা ভাজকো জিজ্ঞাসা কিয়া—'উসকো পুছো—পাত্রী দেখনে ওয়াস্তে জায়গা? হাম ভিতরসে খোঁজ লে করকে জানা থা যে উমেশ পাত্রীকা ছোটা ভাই হ্যায। ভাজকো বোলা—'নেই দরকার নেই হ্যায।' ওয়ান অ্যাণ্ড অল সবকোই স্তম্ভিত হো গিয়া। ভাজ তোর্ফারি ভি কিয়া "

একটি অস্ফুট শব্দ হইল—"মুযে আগ্‌গুন'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—'বাবুজী ভাজ কিসে কহতে হ্যাঁয আপলোক? "

কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন—'আপ অবাক কর দিয়া! 'ভাজ' কিসকো কহতা হ্যায নেহি জানতা হ্যায? দুনিয়ামে তব কেয়া করনেকো আয়া হ্যায? ভাজ হুয়া বড়া ভাইকো পরিবার '

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—'ও সমঝা আপকা মতলব ভাবী' হ্যায। তো ফিন্‌ ভাবীনে কেয়া তফরী কী?

আমি উপরে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রথম ভদ্রলোকটি যে প্রকৃতির এ লোকটি সে প্রকৃতির নয়। কিন্তু কর্তা এমন লজ্জাজনক অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন যে আত্মপ্রকাশও করিতে পারিতেছি না। নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

কর্তা বলিলেন—"ভাজ তোফরি কিয়া—ঠাকুবপো আঁখসে নেহি দেখ করকেই ভালোবাসা …।"

সেই দন্তপিষ্ট-শব্দ—"মুয়ে আগ্‌গুন!"

বোধ হয় আমার নিচের বেঞ্চে ছেলে-মেয়েগুলি ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন—"বাবুজী, অওর দো বচ্চোঁকো ইধর লে আইয়ে; উন্‌সভোঁকি নিন্দ আই হ্যায়, মাজী কি তকলিফ হো রহি হ্যায়।"

কর্তা একেবারে গলিয়া গেলেন, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"কুছভি তাক্‌লিফ্‌ নেহি হ্যায়, পাঁচটা কো জায়গামে যদি পাঁচ দুগুনে দশটা লেড়কা লেড়কি উমেশকো বোহ্‌ীনকা দেহপর লটকায়কে রহে, তোভি—না রাম না গঙ্গা, কুছভি নেহি বোলেগা। শি ইজ্‌ এ ভেরি কোয়াএট লেডি" (অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির স্ত্রীলোক)।

প্রথম ভদ্রলোকটি, বোধ হয়, একটা কিছু বলিবার জনাই বলিলেন—"বাঙালী লেডি সব হোতে ভি হ্যাঁয় বড়া নরম মেজাজ কা।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক সমর্থন করিলেন—"বেশক্‌, বেশক্‌।"

কর্তা আরও গলিয়া গেলেন, শরীরটি আরও যেন ভাবাবেশে এলাইয়া আসিল, বলিলেন—"বিশেষ করকে উমেশকো বোহ্‌ীনকে মাফিক নরম মেজাজ আপলোক কল্পনাও নেহি করনে শকেগা। অকেলা আদমি উদয়াস্ত একঠো না একঠো কাজ লেকরকেই হ্যায়, নিঃশ্বাস ফেকনে কা ফুরসুৎ নেহি রহতা। উসকা উপর হামারা আপিস হ্যায়, লেড়কা লেড়কী সবকা স্কুল হ্যায়, বাচ্চা সবকা দৌরাত্যি হ্যায়—লেকিন কোভ্‌ভি কিসিকো একঠো কড়া বাত নেহি বোলতা হ্যায়, মানে দেহমে রাগ বোলকে কোন বস্তু নেহি হ্যায়।"

রাগহ্‌ীন মানুষটির নিকট হইতে আবার সেই সাগ্নিক মন্তব্য। পরস্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনেই এবং তদুপরি তাহার স্বামীর কাছেই এরকম ঢালোয়া প্রশংসা শুনিয়া বেহারী ভদ্রলোক দুইটিও যেন কিরকম হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোকটি বোধ হয় জড়তাটা কাটাইবার জন্যই বলিলেন—'আপ বড়া ভাগ্যবন্ত হ্যাঁয় বাবু সাহেব।"

কর্তা তখন এত গলিয়া গেছেন যে আর যেন কথা বাহির হইতেছে না। একটু তৃপ্ত হাসির সঙ্গে সামনে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—দাম্পত্যরসে মুখখানি দীপ্ত হইয়া গাল দুইটি টক্‌টক্‌ করিতেছে, স্থুল

মাংসল দেহটি গাড়ির দোলায় অল্প অল্প দুলিতেছে, কতকটা যেন তুরীয় ভাব। একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাগ্যো কা বাত অগর কহা তো আপলোককো সুরসে সব বাৎ কহনে পড়েগা। বিবাহ যো হুয়া সেতো বহুৎ কাটখড় পুড়াযকে। সব কথাবার্তা তো ভাঙ্ গিযা থা। লেকিন "

হঠাৎ যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া একটু চুপ করিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিল—'লেকিন কিয়া বাবু সাহেব?'

প্রথম ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন—"অগর উজুর রহে তো ছোড় দিজিয়ে কহনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন—"না, আপলোক কো সামনে উজুর কেয়া। বোলতা থা বহুত রোজ লেকরকে বিবাহকা কথাবার্তা হোনেসে পাত্র ঔর পাত্রী কা বিচমে একঠো ল্যাভ্—মানে প্রণয় হো জাতা হ্যায় না? হাম ইধার কহা উমেশকো বোহীন ছোড়কে আব কিসিকো বিবাহ নেহি করেগা, উধার উমেশকো বোহীন ভি ধনুর্ভঙ্গ পণ কর লিয়া '

ওদিক হইতে আর কোন মন্তব্য শোনা গেল না বোধ হয় কর্তা অবস্থাটা বাক্যাতীত করিয়া তুলিযাছেন বলিযাই।

পাটনার আগের স্টেশন গুলজারবাগ আসিয়া পড়িল আমায় নামিতে হইবে এখানে, কিন্তু ভদ্রলোকের রোম্যান্স তখন প্রবল বেগে নামিবার উপক্রম করিতেছে। বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। একদিকে স্বজাতি অপরদিকে বেহারী ভদ্রলোক, আবার ওদিকে অসহায়া উমেশকো বোহীন —জীবন্মৃতা হইয়াই আছেন, বাঙালী দেখিয়া তাঁহার অবস্থা যে কি হইবে

গার্ড হুইসিল্ দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি আর চাদরটা গুটাইয়া কোটটা গুঁজিয়া লইলাম সিল্কের চাদরটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কর্তাকেই বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী উচ্চারণে প্রশ্ন করিলাম – কোন ইস্টিশ্যান্ বাবু সাহেব?"

কর্তা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন বুঝিলাম জাত ভাল করিয়া ঢাকা পড়ে নাই। উত্তর করিলেন না। বেহারী ভদ্রলোকেরাও নয়।

উত্তরের দরকার ছিল না। দুয়ারটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া চলতি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম।

আড়ানা আড়াঠেকা

ছুটির দিন। সকালে বারান্দার রৌদ্রে বসিয়া জটলা করিতেছি, বিষয়—একাল ও সেকাল, এমন সময় বাঁকের দুইদিকে দুইটা ঝুড়ি টাঙ্গাইয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে মন্থর গতিতে একটা বেদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কালের খেলা দেখাব বাবু?"

আলস্য মজলিসের সেরা খোরাক ভূত আর সাপ। রামজয় খুড়ো বলিলেন—"আদৎ কাল কিছু থাকে তো বের কর। আজকাল স্কুল পাঠশালায়ও যেমন সব অধমরা মিনমিনে ছেলে, তোমাদের ঝাঁপির মধ্যেও সেই রকম সব সাপ,—ঢোঁরা, হেলে, হদ্দ আমার মত মেড়োসার, তোবড়ান-তাবড়ান একটা আধটা বাস্তু গোখরো"

ললিত মাস্টারের পানে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"যেমন মাস্টার তেমনি বেদে এ যুগের,—নির্বিষদের নিয়ে যত বাহাদুরী।"

বাঁশী শুনিয়া ছেলেমেয়ের পাল ছুটিয়া আসিয়াছিল। ললিত মাস্টার রাগিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় "ওরে বাপ!" বলিয়া ছোটদের পাল একটু পিছাইয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

একটা কালো মিস্‌মিসে কেউটে। ফণাটা উল্টাইয়া প্রায় পিঠের কাছাকাছি লইয়া গিয়া বেদের বাঁশীর পানে তীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দুলিতেছে। বেদে বাঁ হাতটা এক একবার মাথার কাছে লইয়া যাইতেছে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপির ওপর একটা ছোবল পড়িতেছে।

রামজয় খুড়ো প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় পেলে ইটি?"

বেদে বাঁশী থামাইয়া ঝাঁপিটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—চড়ক-ডাঙ্গার বাঁধের ধারে বাবু। দুদিন হল ধরলাম এখনও বুনো রয়েছে বেশি বের টের করি না।"

রামজয় খুড়ো বলিলেন—"ক'রো না বিষদাঁত ভাঙা হয়েছে তো?"

বেদে অন্য ঝাঁপি খুলিল, কুণ্ডলি পাকান একটা সাপ, মাথার উপর টোকা মারিতে উগ্র গর্জনের সঙ্গে একটা দুধে গোখরো প্রায় হাত দেড়েক দাঁড়াইয়া উঠিল। ছেলের দল হুড়মুড় করিয়া পিছাইয়া গেল।

রামজয খুড়োব কথাব উত্তবে 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হযেছে" বলিযা বেদে বাঁশী ধবিল। সাপ রাজকীয পদ্ধতিতে শান্ত গাম্ভীর্যে ডাইনে বাঁযে দুলিতে লাগিল।

শিবু প্রশ্ন কবিল— ওটা জিগ্যেস কবলেন যে? বিষদাঁতওযালা সাপ ওরা সঙ্গে নিযে বেরোয নাকি খুড়ো?"

খুড়ো বলিলেন—"বেবোয না? এমন এমন সাপুড়ে আছে যাবা বিষদাঁত ভাঙা সাপ ছোঁবে না হাত দিযে, তবে সে সব এ সাপুড়ে নয - সে সব হল বনেদী বংশেব সাপুড়ে। একবাব বাণীগঞ্জে এক সাপুড়ে '

বংশেব উল্লেখে বেদে ফিবিযা বাঁশী থামাইযা বলিল –'আমিও বাখি বাবু বিষধব সাপ, বলেন তো বেব কবি, কিন্তু "

অবিনাশদা এতক্ষণ চেযাবেব হাতাব উপব তবলা বাজাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে মুখটা অতিমাত্র বিকৃত কবিযা বলিযা উঠিতেছিল "খেলে কচুপোড়া!"

অদাঁতভাঙা সাপেব কথায সেই মানা কবিল, বলিল—"আজ্ঞে না তালজ্ঞান যেবকম টনটনে তোমাব, আব নতুন সাপ বেব কবতে হবে না।'

কযেকজন প্রশ্ন কবিযা উঠিল—'কেন অবিনাশদা? সাপে তালও বোঝে নাকি? আমবা তো জানি শুধু সুবই ওদেব মিষ্টি লাগে, তাই '

অবিনাশদা ইসারায তাহাদেব থামিতে বলিযা বেদেব বাঁশীব সঙ্গে আবাব তবলাব বোল বাজাইযা চলিল, তাহাব পব হঠাৎ ছাড়িযা দিযা মুখটা বিকৃত কবিযা বলিল—"দেখছিলাম এ-কলিটা বাখতে পাবে কিনা বেটা বেদেব পো না একেবাবে দু'চক্ষু কাণা একটা সোজা কাওযালিতেই জিভ বেব কবে ফেললে। কি জিগ্যেস কবছিলে? হ্যাঁ, সাপে বোঝে তাল আব এমন তেমন বোঝা নয, ওদেব প্রত্যেকটি ছোবল পড়ে সমেব মাথায, যেমন আমবাও সম এলে মাথাটি একটু না নেড়ে পাবি না, শুধু তোমাব আমাব সঙ্গে ওদেব তফাৎ এই যে, সমে ভুল হলেও মারে তবে বেঠিক হলে যে ছোবলটা হাঁকড়ায তাব আর চাবা নেই। শুধু তাই নয স্থান, কাল, পাত্রেব জ্ঞানও থাকা চাই। তুমি যে দুপুরেব সময চিলেকোটায বসে ঠুংবিতে ভৈববী চালাবে –সেটি ওদেব কাছে হবাব যো নেই।"

গোবিন্দ অবিনাশেব কাছে তবলা শিখিতেছে, গুবুদেব বলে, আর

এদিকে তালজ্ঞ মাত্রেরই উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। প্রশ্ন করিল "ভয়ংকর চটে যান বুঝি, গুরুদেব?"

অবিনাশদা সংক্ষেপে বলিল—"যা বোঝ এই থেকে।"

রামজয় খুড়ো বলিলেন—"চটবে না? কী ছেলেমানুষের মত বকছ? অষ্টপ্রহর রাগতালের রাজা শিবের কাঁধে চড়ে সেরা তালে রাগ রাগিণী শুনে শুনে কান কিরকম সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে! "

অবিনাশদা বলিল—"খুড়োর অমনি ঠাট্টা হল! বেশ বাবা অপরাধ হয়েছে এ আসরে তালের কথা তুলে। কতকগুলো লাউডগা সাপ জোগাড় করলে কোথা থেকে হে?"

গোবিন্দর সাপ খেলানর দিকে মন ছিল না। একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া অবিনাশদার তালমত্ত হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"এ সব বাজে সঙ্গত ছাড় তুমি গুরুদেব তুমি নিজেকে বড্ড খেলো করে ফেল। হুঃ সাপে নাকি আবার সমের মাথায় ছোবল মারে! কী যে বাজে বক তুমি!"

অবিনাশদা বলিল— "না বিশ্বাস হয়, নিজে গিয়ে দেখে আসতে পার। এমন কিছু বিলেতে কিম্বা অ্যামেরিকায় নয়, যে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে যেতে হবে।"

আরও কয়েকজন ধরিয়া বসিল—"কি ব্যাপার বল ওবিনেশদা। খুড়োর ঐ রোগ নিজে যখন আজগুবি গল্প ছাড়বেন তখন কিছু না। পরে সত্যি বললেও ঠাট্টা "

অবিনাশদা উপরোধের চাপে বলিল - আচ্ছা, বলছি, বেদের পো তার মাল সামলে নিক্‌ আগে।"

সবাই আবার ধরিয়া পড়িল। রামজয় খুড়ো ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন— 'সাপের গুষ্টি সামনে থাকতে থাকতেই হোক্‌ না, দিব্যি কিণ্ডারগার্টেনের মত হবে। "

ললিত মাস্টারের দিকে একটু বক্র দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

অবিনাশদা বলিয়া যাইতে লাগিল—"আমার ওস্তাদের মুখে শোনা, মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। ওস্তাদ নবী খাঁ। বাঙলায় অতবড় পাখোয়াজী এ পর্যন্ত তো জন্মায় নি, পরে জন্মাবে কিনা অবশ্য বলতে পারি না। ওস্তাদজীর গ্রামের লাগোয়া গ্রাম মিঠেপুর। সেই গ্রামে ওস্তাদজীর.

গুরু সনাতন মুখুজ্যের বাড়ি। মহা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। পাখোয়াজী? — ওস্তাদজী প্রায়ই দুঃখু করে বলতেন — 'দেশের লোকে আমায় নিয়ে বড়াই করলে তো যথেষ্ট; দুঃখু রইল তাঁকে একবার তাদের সামনে বের করতে পারলাম না; তাহলে পাখোয়াজ বাজান কারে বলে সবাই একবার দেখত।' ... একেবারেই বেরুতেন না কিনা, নিজের পুজো আহ্নিক আর ঐ একটি পাখোয়াজ, ব্যস্।... ওস্তাদজী বলেন — 'যখনকার কথা বলছি, তখন গুরুদেব ইন্তেকাল করে গেছেন। তাঁর ছেলে আছে বেঁচে। কিছু নয়, তবুও হ্যাঁ, বাপের বেটাই তো? ঘরে ফিরে গ্রামে এসেই আমার প্রথম কাজ গুরুর ভিটের মাটি ছুঁয়ে আসা আর গুরুমাকে দর্শন করা। গেলেই পাঁচটা লোক এসে জোটে, একথা, সে কথা, গুরুর মাহাত্ম্য — এই সব আলোচনা হয় একটু। একবার কথায় কথায় গুরুভাই বললে — 'ওহে নবী, তা নয় হোল, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলব বলব করে আজ পর্যন্ত যে বলা হয় নি। বাবা যে ঘরটাতে থাকতেন তার চালের মাথায় মাঝে মাঝে ঠক্ ঠক্ করে কি একটা শব্দ হয়। আজ থেকে নয়; বাবা বেঁচে থাকার সময় থেকেই এদানি হত এটা। বাবা জানতেন, তবে আমাদের কখন কিছু বলেন নি। একবার আমার হঠাৎ কানে গেল। ঠক্ ঠক্ শব্দ কিসের হয়?.. বাবাকে বলতে বাবা অগ্রাহ্য করে বললেন — ও কিছু নয়, তোদের ছেলেমানুষদের সব কথায় থাকতে নেই। তারপরে আর জিগ্যেস করি নি; দেখেইচো তো কি রকম রাশভারী লোক! আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি — শব্দটি হোত গান বাজনার সময়, তাও আবার সব গান বাজনার সময় নয়।'

" 'গুরুভাইয়ের কথাটা শুনে সবাই আমরা মুখ চাওয়া চাওযি করলাম। দু'একজন আগে শুনেও ছিল; যার যা আন্দাজ হল বললে — কেউ বললে — তক্ষক, কেউ বললে উপদেবতা, কেউ বললে অন্য কিছু। আমার মন বললে ওসব কিছু নয় — গুরুর যেমন বারণ করবার ভঙ্গী শুনলাম তাতে মনে হল — এ গুরুর ইষ্টদেবী; তবে কথাটা ভাঙলাম না।... এমন সময় হবি তো হ — ঠিক তাল বুঝে এক বেদে এসে হাজির। সব শুনে বললে — 'যদি আদেশ করেন তো উপদেবতা কেমন তা আড়ার মাথা থেকে নামিয়ে এনে একেবারে আপনাদের সামনে হাজির করে দেখাই; তবে যেমন বুঝছি নামবে একটু

চটে, আপনাদের একটি গণ্ডী এ'কে দিচ্ছি তার মধ্যে থাকতে হবে সবাইকে। দেখুন, রাজি?'

"'অবিশ্যি, তখন ঝোঁক পড়ে গেছে একটা, সবাই রাজি হলাম। বেদে ঝাঁপির মধ্যে থেকে একটি খড়ির ডেলা বের করে গুরুদেবের ঘরের একটু দূরে খানিকটা জায়গা নিয়ে একটা আঁক কেটে দিলে, তারপর একমুঠো ধুলো নিয়ে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়ে ছড়িয়ে দিলে। বললে—'আপনারা ঢুকুন্ এর মধ্যে, কিন্তু খবরদার বেরুবেন না যেন। তারপর গুরুদেবের ঘরের সামনে গিয়ে বসে দিলে বাঁশীতে ফু'।'.. ওস্তাদজী বললেন—হ্যাঁ, সার্থক বাঁশী ধরে ছিল লোকটা। মনে হচ্ছে যেন তাবৎ জিনিসকে টেনে সামনে হাজির করবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যেন আমাদেরও মনে হতে লাগল গণ্ডী ছেড়ে আরও কাছে গিয়ে শুনি। বেদের পো ঠিক বুঝছে সেখান থেকেই—যেন জানা কথাই, এমনটি হতেই হবে; বাঁশী বাজবার মাঝেই কয়েকবার হাত নেড়ে সাবধান করে দিলে—'উঠবেন না সব।' কিন্তু সাপ কৈ?...মুখ চোখ এদিকে রাঙা হয়ে এসেছে—কপালের শিরগুলো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে আমাদের সবার চোখ টাটিয়ে উঠল—না সাপ, না সাপের কোন চিহ্ন। প্রথমটা কাওয়ালীতে ভীমপলশ্রী ধরেছিল একটা উঁহু..। পালটে দিলে;—কার্ফায় একটা ভূপালী—তারপর একটা ইমন যৎ—একটা মুলতান, একতালায়—আবার কাওয়ালীতে ফিরে এসে একটা লাউনী ধরলে—শেষে তেওড়ায় একটা কানেড়া রাগিণীকে ঘে'টে ঘুঁটে একশা করে বাঁশীটা মাটিতে আছড়ে ফেলে আমাদের দিকে চেয়ে রেগে বলে উঠল—'গরীব পেয়ে আপনারা ঠাট্টা করছেন বাবুসব। হাজার গজের মধ্যে এখানে কোথাও যদি সাপ থাকে তো আজ বনের ফণী বনে ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নাককান মলব।'"

অবিনাশদা ললিতমাস্টারের হাত থেকে বিড়িটা লইল, দুইটা টান দিয়া আবার আরম্ভ করিল—

"'গণ্ডীর খানিকটা দূরে আতা তলায় কখন একটা লিকপিকে গোছের ছোঁড়া এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক কখন এসেছে টের পাই নি, তবে তাকে দেখে যখন কয়েকজন গণ্ডীর মধ্যে চলে আসতে ইসারা করলে সে গ্রাহ্য করলে না। কার কাছে এসে দাঁড়াবে—সেই ভেবে কেউ জিদও করলে না।

তা ভিন্ন সবাব তখন শুধু কি হবে কি হবে এই একটি ধুকপুকুনি, ওব দিকে খেযালই কবে নি অত। লোকটির গাযের রঙ কালো কুচকুচে খুব ময়লা একটা কাপড় পরা, হাঁটুর কাছে কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে গেবো দেওযা। গাযে খড়ি উঠছে, মাথায এক মাথা বড বড় চুল, কখনও তেলেব মুখ দেখেছে বলে মনে হয না—গোড়াব দিকটা চাপবাধা, ডগাব কাছে তামাটে। লোকটা বাঁশীব দিকে চেযে মিঠে মিঠে হাসছিল আব একটি ঘাসেব শীষ নিয়ে দাঁতে কাটছিল।'

" তাব দিকে নজব পড়তেই বেদে যেন একটা ছুতো পেযে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ঝংকাব দিযে বললে— গন্ডীব বাইবে যে?'

" ছোঁড়াটা তেমনি ভাবেই দাঁত বেব করে হেসে বললে— ভযটা কাব? ও তো নামবে না জানাই, শুধু তোমার দমটা দেখছিলুম।'

' বেদে আবও বেগে বললে– 'নামতো ওব বাপ নেই মোটে তো নামবে কোথা থেকে?'

' 'ছোঁড়াটা তেমনি নির্বিকাব ভাবে বললে— ওব বাপ গাছে আছে কি পাহাড়ে আছে—ওই বাজনাতে অবিশ্যি নামবে এ কিন্তু চালেব আড়া থেকে এ বাজনায নামবে না। অবিশ্যি আছে কিনা জানি নে তবে যদি থাকেই তো স্রেফ বাজনাব ভুলে নামে নি। '

' 'বাগে অপমানে বেদেব পো দাঁড়িযে উঠে চীৎকাব জুড়ে দিলে-আমায বলে বাজনার ভুল—একটা চ্যাংড়া, কোমবে কাপড় জোটে না '

' সাপ ছেড়ে তখন সবাই একটা ঝগড়া বাধাবাব দিকেই ঝুঁকল কিছু একটা চাই তো?—অবিশ্যি গন্ডীব মধ্যে থেকেই কেন না ভযটা তখনও লেগে বযেছে। শেষে আমি, গুবুভাই, আরও কযেকজন মুবুব্বী জিজ্ঞেস কবলাম তুই যে মাতব্ববী কবছিস, তুই নিজে জানিস তাল লযেব কিছু—পাবিস নামাতে? যানা বাপু, যেখান থেকে এসেছিস সেখানে, মিছে গুলতান লাগাস কেন? হাঁ বুঝতাম নিজে পাবিস তাহ'লে ববং এক কথা ছিল।

' ছেলেটা সবাইকে থ কবে দিলে। সেই বকম নবম ভাবেই বললে—'তাল লয জানি একথা সনাতন মুখুজ্যেব ভিটেয দাঁড়িযে বলবে এমন কাব বুকের পাটা আছে বাবু মশাই? তবে হুকুম করেন একটু চেষ্টা কবতে পারি।'

" 'সবাই বললে—'দাও তো হে বেদের পো, চেষ্টাটাই কি রকম করে দেখা যাক একবার।' ...

" 'লোকটা আস্তে আস্তে এসে বাঁশীটা ভূঁয়ে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বসল, ফুঁ দেবার আগে আবার একবার আমাদের পানে চেয়ে দাঁত বের করে হেসে বললে—'আপনারা সব মা-জানকীর মত গণ্ডীর মধ্যে কেন? সব বেরিয়ে এসে যার যেখানে খুশি দাঁড়ান না। গেরস্তকে জেলে না দিয়ে আমি চোরের জন্যেই জেল তোয়ের করে রাখছি'—বলে বাঁশীর ডগা দিয়েই নিজের সামনেটিতে হাত দুয়েক লম্বা, হাত খানেক চওড়া আঁক কেটে দিলে। তারপর বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে..."

এই বেদেটা এতক্ষণ ছেলে-মেয়েদের সাপের খেলা দেখাইতেছিল, গুছাইয়া লইয়া বলিল- "আমার হয়ে গেছে বাবু, এবার বকশিষ..." গোবিন্দ, শিবু প্রভৃতি কয়েকজন রসভঙ্গ হওয়ায় একেবারে মারমুখো হইয়া উঠিল। গোবিন্দ পকেট হইতে একটা রেজগি বাহির করিল, তাহার পর সেটা চার আনি দেখিয়া সামান্য মাত্র দ্বিধা করিয়া বেদের পানে ছুড়িয়া দিয়া বলিল-"যা এইবার।. হ্যাঁ, বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে .."

অবিনাশদা বলিল—" 'বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে ধরলে আড়াঠেকায় একটা আড়ানা।' "

রামজয় খুড়ো হুঁকো থেকে মুখটা সরাইয়া ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে বলিলেন--"ও! এরই অপেক্ষা!—আড়ার সাপ বলে?—স্থান-কাল—পাত্র?"

অবিনাশদা খুড়োর কথায় কান না দিয়া বলিল- "আড়ানা ধরলে।" ওস্তাদজি বলতেন—'গুরুর পায়ের কৃপায় হিন্দুস্থান ঘুরে ঘুরে রাগ আর তাল ঢের শুনেছি - কাশী বল, লক্ষ্ণৌ বল, গোয়ালিয়ার বল, বরোদা বল—কোন বড় আসরই বাদ যায় নি, কিন্তু ছেঁড়া চিরকুট পরা সেই কাঁকলাসের মত লিকলিকে ছোঁড়া যা হাজির করলে তার মোকাবলায় এ জন্মে কিছু আর শুনিও নি, শুনবও না।' ওস্তাদজি বলেন—'মিনিট পাঁচেক হয়েছে কি, হয় নি—এমন সময়, যেই এদিকে সম্ পড়া, ঘরের বারান্দার খুঁটির মাথায় ঠকাস করে একটা শব্দ! তারপর—কী সে চেহারা! ধপ্ ধপ্ করছে সাদা

সাত হাত লম্বা এক পদ্ম গোখরো—শিবের মাথা থেকে যেন সেই টাটকা ,
নেমে এসেছেন।.. সবাই অবশ্য সরে গেল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই কোন দিকে।
আস্তে আস্তে আড়াঠেকা তালে গা দুলুতে দুলুতে সেই গণ্ডীটির মধ্যে এসে
কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলেন—মাঝে, শিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একবার একটা

'যেন আকবর শা তানসেনের আলাপ শুনছেন'

সম্ পড়েছিল—শেষ ধাপটিতে একটি শানফাটান ছোবল। তারপর চক্করটি
তুলে ডাইনে বাঁয়ে দুলে দুলে সে কি রাগিণী শোনবার ঘটা! যেন আকবর শা
তানসেনের আলাপ শুনছেন। সমের মাথায় ছোবলটি ওদিকে ঠিক আছে,
হিসেবের এতোটুকু ভুল নেই। কতক্ষণ যে চলেছে এই রকম সবাই ভুলেই

বসে আছি ... এমন সময় এক কাণ্ড হল।' ... খুড়ো, কলকেতে আছে তামাক একটু বাবা?"

রামজয় খুড়ো হুঁকোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"আছে যথেষ্টই; কিন্তু যে রকম লাগিয়েছ তাতে তোমার কি এখন তামাকে শানাবে?"

ছেলেরা সব কাঁই মাই করিয়া উঠিয়া বলিল—"আমাদের ঠিক 'কাণ্ডের' মুখটিতে বসিয়ে রেখে তোমার এই সময় তামাক খাবার ধুম পড়ল ওবিনেশদা? ... নাও, হয়েছে, বল ..."

তাহাদের থামিতে ইসারা করিয়া অবিনাশদা তাড়াতাড়ি কয়েকটি টান দিয়া লইল; খুড়োকে হুঁকাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"ওস্তাদজি বলেন—'এমন সময় এক কাণ্ড হল। সেই বেদেটা একেবারে কাছে দাঁড়িয়েছিল, বুঝতেই পার হিংসেয় জ্বলে মরছে একেবারে। সাপের সঙ্গে ঘর করে ওসব জাতের লোকদের হিংসে জিনিসটা আবার বেশি উগ্র। মুখ নিচু করে ঠায় চেয়ে আছে, চোখ দুটো যেন ভাঁটার মত জ্বলছে! আলাপ এদিকে চলতে থাকুক। যখন খুব জমে এসেছে, একটা তেহাইয়ের ঝোঁক—এলো—এলো—এলো ... ঠিক মক্ষম জায়গায় বেটা বেদের পো দিলে ঠুকে .. সঙ্গে সঙ্গে তাল কাটা, সঙ্গে সঙ্গে বেঁকিয়ে এক রাম ছোবল, সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে উল্টে পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে ...'

গোবিন্দ অর্ধোত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"মৃত্যু!! আহা! ..."

অপর দু'একজন প্রশ্ন করিল—"কার ওবিনেশদা?"

অবিনাশদা ব্যঙ্গের হাসির সহিত বলিলেন "কার তাও বলে দিতে হবে? কার বদমাইসিতে কাটল তাল? পদ্ম গোখরো—সাপের রাজা, তার কাছে তো অবিচার হবার জো নেই। ... কিন্তু সেই যে উপরে গিয়ে উঠলেন, বিষ তুলিয়ে নেবার জন্যে হাজার রকম চেষ্টা করলে—বাঁশী, মৃদঙ্গ ধুলো-পড়া, কড়িচালা ... উহুঁঃ বয়েটি গেছে তাঁর নামতে।

"ওরা ওঘর ছেড়ে দিলে; নমুনা দেখে কার আর সাহস হয় বল? কয়েকদিন চুপ চাপ তারপর গর্জন আরম্ভ হল—ওস্তাদজি বলেন—'একদিন গিয়ে শুনলাম—সে কী গর্জানি রে বাপ! এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! যেন কামারখানায় ডজন খানেক হাপর একসঙ্গে চলছে। কিছুতেই ঠাণ্ডা করা যায় না, আর যাবেই বা কে সেদিকে ঠাণ্ডা করতে? বেদেরা তো সে

তল্লাটই ছেড়ে দিলে। তখন কোথা থেকে একদিন সেই ছোঁড়া এসে ; উপস্থিত। বললে—'বাজনা কতদিন হয় নি তাই বলুন আগে।'— বাজনা তো সেই দিন থেকেই বন্ধ আছে। শুধু 'হুঁ' করে একটু হাসলে। বাঁশী তো সে তল্লাটে কেউ রাখে নি; ওস্তাদজি বলেন—গুরুদেবের পাখোয়াজটা নিয়ে আসা হল। প্রথম ঘা'টি পড়া—গর্জানিও ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তারপর ধরলে আড়াঠেকার বোল। অবশ্য পাখোয়াজের আড়াঠেকা জমবার কথা নয়, কিন্তু হাতের গুণ বলে একটা জিনিস আছে তো?.. নিশ্চুপ ঠাণ্ডা একেবারে—শুধু ঐ সম্ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালের আড়ায় একটি করে—ঠক্—ঠক্—ঠক্...'

"যাবার সময় ছোঁড়া বলে দিয়ে গেল—'রোজ সন্ধের সময় একবারটি করে এ বাজনাটি যেন হয়ই, নয়তো অনর্থ হবে—অন্য তাল লয় নয়, আড়াঠেকা, আর যদি আসে তেমন কেউ গাইয়ে কি বাজিয়ে তো আড়ানাটাও একবার করে মাঝে মাঝে শুনিয়ে দেবেন।'

"ওস্তাদজি বলেন—'রোজ সন্ধেয় দরজা থেকে হাত দুয়েক এদিকে এগিয়ে একবার করে তাঁকে আড়াঠেকাটা শুনিয়ে দেওয়া হয়। কোনদিন যদি একটু ব্যতিক্রম হল তো সুরু হল গর্জানি!... এমনি বেশ আছেন কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই...' "

তীর্থ ফেরত

অন্নদাপিসী তীর্থ করিয়া ফিরিলেন। উঠিয়াছিলেন শিয়ালদহে। কথা ছিল কামাখ্যা, প্রয়াগ, পুষ্কর, দ্বারকাধাম, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, জগন্নাথ—আর এর মধ্যে ছোট বড় যে যে তীর্থ পড়ে সব সারিয়া মাস চারেক পরে ফিরিবেন। আজ মাত্র তের দিনে কামাখ্যা, কাশী, গয়া আর বৈদ্যনাথধাম হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। এই রকম যে হইবেই জানা কথা, কেহ বিস্মিত হইল না; পিসী যে তেরটা দিন গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে থাকিতে পারিয়া-ছিলেন এইটেই বরং পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

বাড়িতে পেণছিবার বোধ হয় আধ ঘণ্টাটাকের মধ্যেই গঙ্গা-স্নানের খাটো কাপড়টা পরিতে দেখিয়া বড়বধূ বলিল, "সমস্ত রাত জেগে গাড়ির ঝাঁকানিতে হা-ক্লান্ত হয়ে রয়েছ মা, আজ না হয় বাড়িতেই তোলা জলে নেয়ে নাও না, এই পোটাক পথ আবার হাঁটা—"

পিসী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "সঞ্চয় যত না হক, আসতে না আসতেই খরচ মা?—কতটুকুই বা?—দিয়ে আসি দুটো ডুব।—পাড়ায় এদের সব খবর কি?"

শাশুড়ীর অলক্ষিতে বড়বউ আর সেজোবউ একটু ঠোঁট টিপিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। নূতন নাতবউ সরযূ, দিদিশাশুড়ীর তীর্থপ্রত্যাগমন উপলক্ষ করিয়া এই প্রথম আসিয়াছে। বলিল, "সবাই তো বেশ ভালই আছে, না কাকীমা?—দেখন-হাসিদের সঙ্গে ঘোষালদের যে ঝগড়াটা ছিল সেটাও মিটমাট হয়ে গেছে—দেখন-হাসির সাধে ওরা সবাই খেতে এসেছিল—না বাপু, ঝগড়া আমি একেবারে দেখতে পারি না, কেমন যেন—"

পিসী হঠাৎ যেন অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওমা, ঝগড়া নাকি আবার কারুর ভাল লাগে!—নে, শীগগির আমার কমণ্ডলুটা কোথায় আছে দে দিকিন—রোদ চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে।...ওরা নিজেই মিটিয়ে নিলে ঝগড়াটা, না—"

সেজো বউ বলিল, "না, রতন ঠাকুরঝি ওপরপড়া হয়ে মিটিয়ে দিলে।"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "ভাল করেছে। মুয়ে আগুন, এইটুকু পাড়া তাতে আবার ঘর ঘর ঝগড়া! ক'টা দিন বাইরে বাইরে ছিলাম, কি তৃপ্তিতে

যে কেটেছে! ফিরতে কি মন সর্বছিল? কেবলই মনে হচ্ছিল গাঁযে গিযে আবাব সেই—এব সঙ্গে ওব মুখ দেখাদেখি নেই, এ ওব বাপান্ত না কবে জলস্পর্শ কবে না—ওদেব দু' বাড়িব মাঝখানে দেযাল উঠেছে দে না বে কমণ্ডলুটা, আব মালাগাছটাও দিস,—তুমি দেখ তো একবাব বড বউমা—"

নাতবউ একটু আবদাব কবিল, "আমাযও নিযে চল ঠাকু'মা হ্যাঁ—"

"তুই কাল যাস তখন। কনে বউ পা টিপে টিপে চলবি—আমি থপ করে দুটো ডুব দিযে আসি।"

পিসী চলিযা গেলে আবাব দুই বউএ মুখ চাওযা চাওযি কবিল। সেজোবউ ঠোঁট উল্টাইযা বলিল 'উনি আবাব তীর্থ কববেন! গেছি আব কি।"

বেলেব ওপাবে গঙ্গা। চবকি ঘুবাইযা বেল পাব হইযা প্রথমেই চাটুজ্যেদের বাড়ি। সদর দবজাটা পাব হইলে বাইবেব উঠানটা পড়ে। ঝি হাবানেব মা গবুব জন্য বঁটিতে বিচালি কাটিতেছিল দেখিযা কাজ থামাইযা প্রশ্ন কবিল "ওমা, পিসী যে গো। এই শুনলাম মাসচাবেক এসবে নি। দাঁড়াও একটু পাদকজল নি, তিথি কবে এলে। কি কি তিথি হল পিসীব গা?"

"মুযে আগুন আমাব আবাব তিথি! মন পডে থাকে তোদেব কাছে এক দণ্ড যে মোনোস্থিব কবে তোব হাবানে কেমন আছে? জ্বব দেখে গিযেছিলুম—"

সদব উঠানেব ওদিকে অন্দববাডি। রান্নাঘবেব জানালা দিযা সবযুব দেখন হাসি বলিল "অনা পিসী যে গো।"

নানাবিধ প্রশ্ন-মুখব তিন চাবিটি কৌতকদীপ্ত মুখ আসিযা জানালায জড হইল।

"আসছি কেমন আছিস সব?' বলিযা অন্নদাপিসী অন্দববাড়িব দবজা দিযা ভিতবে প্রবেশ কবিলেন।

সবযুব দেখন-হাসিব মা ভাঁড়াব ঘব থেকে বাহিব হইযা আসিল। সমবযসী। পাডাব বউ সেই সম্পর্কে ভাজ। বেসনেব হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "ফলল তো আমাব কথা? মবণ, তুমি আবাব তিথি কববে!

...তোর পিসীকে একটা আসন দে না রেণু।"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "না, আর বসব না বউ, তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে আসি।—সত্যিই একা একা মন টিকল না। থাকতিস তুই সঙ্গে, আরও গোটাকতক তিথ সারতাম।...কিন্তু কথা চাপা দিলে শুনব না তো। ঘটা করে সাধ দিলি মেয়ের, শত্রুমিত্র পাত পেতে গেল, শুধু—"

পিসী হঠাৎ থামিয়া গেলেন, ছেলে-মেয়েরা জড় হইয়াছিল, বলিলেন, "সর্ দিকিন তোরা, ছেলেমানুষেরা সব কথা শোনে না।"

উহারা সরিয়া গেলে গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন—"হুঃ, উপযুক্ত হয়েছে। আমি যাবার সময়েই বউমাকে বলে গেছলাম—দেখো, রেণুর সাধে কালো-বউ যদি ঘোষালগিন্নিকে দিয়ে না পাত পাতায় তো আমার নামে কুকুর পুষো, ও তেমন সেয়ানা মেয়ে নয়।.. বললে পেত্যয় না যাবি বউ, যখন তোর অমনটা হল আমি ঘোষালগিন্নির শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম—বলি—একটা শোকের সময় অতি বড় শত্রুতেও একবার এসে পাশে দাঁড়ায়, তা...থাক্, সে সব কথা শুনলে আবাব...ঐ যে বললাম—উপযুক্ত হয়েছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিস বউ, আমার শুধু আপসোস রইল গোমড়ামুখীকে নিজের চোখে বড় বড় মাছের গেরাস তুলতে দেখলাম না।..ভাল কথা!—গেরাসের কথায় মনে পড়ে গেল—খাওয়ানোর ব্যবস্থা নাকি দু'রকম হয়েছিল বউ?"

চাটুজ্যে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি ঠাকুরঝি!"

"চমকো না, চমকাবার এখনও ঢের বাকি আছে। শুধু খাওয়াবার দু'রকম ব্যবস্থা নয়, পরিবেশনেও মুখ দেখাদেখি হয়েছিল।"

চাটুজ্যে গৃহিণী ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে বললে এ কথা ঠাকুরঝি?"

"কে বললে, বউকে এখন সে কথা বল! কে দরদ দেখিয়ে ভাব করাতে...থাক্ বাপু। কথাটা শুনলাম এসেই, তাই ভাবলাম বউকে একবার বলে যাই—আপনভোলা সাদাসিদে মনিষ্যি; দুনিয়াটাকে নিজের মতন করে দেখে...কিন্তু ব্যাগতা করি বউ, আমার নাম করিস নি কারুর কাছে—সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না; নেহাত শুনলাম কথাগুলো—গায়ে লাগল, তাই—"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর তুলিয়া সহজভাবে বলিলেন, 'তা'হ'লে তুই যাবি না তো এখন? ভাবলাম, যাই, বউকে ডেকে নি তা যা ভাঁড়াব নিয়ে পড়েছিস!— ভাঁড়াব ভাঁড়াব করেই মরবি তুই যাই সমস্ত রাত জাগা, শরীরটা যেন আর বইছে না।"

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে যখন বাহির হইলেন পিসীর মুখের ভাবটা বেশ প্রসন্ন। দুইটি শিশু বাহিরে কলহের উপক্রম করিতেছিল, মাঝখানে দাঁড়াইয়া মিষ্ট কথায় দুইজনকে ঠাণ্ডা করিলেন বলিলেন ঝগড়া মারামারি কি করতে আছে বাপ? ছি,— লক্ষ্মী ছেড়ে যান। কাশী থেকে কাঠের পুতুল এনেছি নিয়ে এসো আমার কাছ থেকে—ঝগড়া করে না।"

চাটুজ্যেবাড়ি ছাড়াইয়া রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরিয়াছে, তাহার পরেই একটা ফেঁকড়া চৌধুরীপাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে। সেটা গঙ্গার যাওয়ার পথ নয় অনেক ঘুরিয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গায় যাইবার পথ না হইলেও অন্নদাপিসী পিছনে একবার চাহিয়া লইয়া এই গলিটাতেই প্রবেশ করিলেন।

একটু গিয়াই ঘোষালদের বাড়ি।

ঘোষালগিন্নি একগোছা পূজার বাসন আর খানিকটা তেঁতুল লইয়া ঘাটে যাইতেছিলেন। পিসীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন 'ঠাকুরঝি যে গো! আজ সকালে বুঝি? মিটল তিথের সাধ? অল্পেই হাসা রোগ আছে, নথের ঘেরার মধ্যে মুখটি হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

পিসী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন তুই ঘাটে যাচ্ছিস কি লো বউ তোর তো বিছানায় পড়ে থাকবার কথা!

ঘোষালগিন্নি সশব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন মরণ! বিছানায় পড়ে থাকতে গেলাম কেন? তুমি তীর্থি ঘোরো লম্বা লম্বা পা ফেলে আর ঘোষালবউ বিছানায় পড়ুক!"

পিসী যেন ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়া উপর দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন একটু, তাহার পর আত্মস্থভাবেই ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন 'তা হ'লে কি ঠাট্টা করলে?—তাই হবে নিশ্চয় আমারই বোঝবার ভুল হয়েছে।"

ঘোষালগিন্নি হাসিতে হাসিতেই বলিলেন 'দেখ ঢং এলেন আর আরম্ভ হল! হ্যাঁ গা, শয্যাধরা হয়েছি বলে কে ঢং করলে? জলজ্যান্ত মানুষ

দ্'বেলা দেখছে লোকে। তা বসবে না একটু ?—দাঁড়িয়ে থাকবে—অ্যাদ্দিন পবে তিথি কবে ফিবলে ?"

"না, বসব না বউ সমস্ত বাত জাগা, শবীব ভাজা ভাজা হযে বযেছে, বোদ্দ্বও বেড়ে উঠছে চড়চড় কবে। তাড়াতাড়ি দ্টো ডুব দিযে আসি—কিন্তু বলিহাবি ঠাট্টা মা খ্রে খ্বে নমস্কাব সবাইকে। ঠাট্টা শ্নলে পেটেব মধ্যে হাত পা সেঁদিযে যায ভযে! আমি ভাবছি কখন গিযে বউএব হাসি-হাসি ম্খখানা দেখব। আব কি আঁতে ঘা দিযে ঠাট্টা বাপ্!"

ঘোষালগিন্নিব হাসিহাসি ম্খটা নিষ্প্রভ হইযা উঠিল একটু উৎকণ্ঠিত-ভাবে প্রশ্ন কবিলেন 'আঁতে ঘা দিযে কি ঠাকুবঝি ?"

থাক সে কথা বউ, ছেলেপ্লেগ্নো আছে কেমন বল দিকিন ? পান্তীটাব অস্খ দেখে গেছলাম—"

'সেবে উঠেছে।'

হাতেব বাসনগ্লা পাশে শানেব বেঞ্চিব উপব বাখিযা ঘোষালগিন্নি একটু জিদেব সহিত বলিলেন 'না তুমি ন্কুচ্ছ ঠাকুবঝি, বলতেই হবে,—আমি জানি উঠেছে একটু কথা।

অন্নদাপিসী গলাটা খাটো কবিযা বলিলেন, "কে বলেছে আমি নাম কবতে পাবব না বউ—কিনি দবদ দেখিযে তোমাদেব মধ্যে ভাব কবাতে গেছলাম ৴ বাস্তায দেখা হল—অপবাধেব মধ্যে জিগোস কবলাম—হ্যাঁগা বতন—"

পিসী যেন নিজেকে সম্ববণ কবিযা লইযা হঠাৎ থামিযা গেলেন আত্ম-ধিক্কাবেব সহিত বলিলেন "দেখলে ভীমবতি! বলব না—না, আপনি ম্খ দিযে বেবিযে গেল নামটা। বলে ধম্মেব কল বাতাসে নড়ে—জিগ্যেস কবলাম—বতন ঘোষালগিন্নি আছে কেমন বলতে পাবিস ? ঘোষালগিন্নি তোমাব কুপোকাৎ হযেছেন। চাবটে ভোজ বাদ গেছল, আব লোভ সামলাতে পাবেন কি ? বেণ্ব সাধে তাড়াতাড়ি ভাব কবে নিযে চাবটে ভোজেব খাওযা এক সঙ্গে খেযে "

ঘোষালগিন্নিব ম্খটা একেবাবে পাঁশ্টে হইযা গেল। যেন অন্তরে অন্তবে শিহবিযা উঠিযা প্রশ্ন কবিলেন, "বতন এই কথা বললে ঠাকুবঝি, রতন ?"

পিসী বলিলেন, "তুই মানুষ চিনিস না বউ, সেই জন্যেই তো তোর কথা ভেবে মরি। তিথিই করতে থাকি আর যাই করতে থাকি – মনে হয় আপনভোলা মানুষ — বউটা কার না কার কাছে বোধ হয় অপদস্থ হচ্ছে।"

ঘোষালগিন্নির পাঁশুটে মুখটায় আবার রং ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কান দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল; শুধু প্রশ্ন করিলেন, "রতন ওই কথা বললে?"

পিসী গলাটা একেবারে চাপিয়া আনিলেন, ছোবলমারা গোছের করিয়া হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "শুধু রতনই বলি কেন গো। ঐ চাটুজ্যেগিন্নি — সেধে তো যেতে চায় নি, আত্তিস্য দেখিয়ে ভাব করে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলি একটা মানুষকে, তার পরে ওই কথা?"

ঘোষালগিন্নি বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চাটুজ্যেগিন্নি!"

"ঘোষালদা ঠিকই বলতেন বউ তুই আর বাড়লি নি যেমন কনে বউটি এসেছিলি, তেমনই রয়ে গেলি। — মাগি কম নাকি? গেছলাম কিনা, বলি ক'দিন পরে এলাম, একবার দেখাটা করে আসি -- সে কী চিপটেন কেটে কেটে কথা মা! কী হাসি! - কী ছড়া কাটা! - সেই তো মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি?' — ঠাকুরের শ্রাদ্ধয় মুখ ফিরিয়ে থেকে, এলি কিনা, সাধের খাওয়ার সময়! এটুকু লোভ সামলানো গেল না?

ঘোষালগিন্নি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। কনে বউএর সঙ্গে তাঁহার নিজের কোনও যুগে কোনও সাদৃশ্য ছিল কি না সন্দেহ, আর সে-কথা ভুক্তভোগী ঘোষালদার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। চাটুজ্যেদের লইয়া পাড়ার অন্তত কুড়ি বাইশখানা ঘর অনায়াসে শুনিতে পাবে কণ্ঠস্বরকে এইরকম চড়া পর্দায় বাঁধিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেধে গিয়েছিলুম? আমায় বলে কি না — সেধে গিয়েছিলুম? — মনে নেই — শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল? — আন্না বামনি যাবে সেধে নেমন্তন্ন খেতে?"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "চুপ কর্ বউ, লোকে মনে করবে আমি বুঝি তোকে খেপিয়ে দিয়ে গেলুম। মুয়ে আগুন, আমার নিজের বলে মরবার ফুরসৎ নেই — যাই বউ, চুপ কর — এদিকে রোদটা দেখতে দেখতে চড় চড় করে উঠেছে — চাঁদি ফেটে যাচ্ছে মাথার। নে, মাথা গরম করিস নি; একে তোর মাথার রোগ লেগেই আছে।"

রোদে অবশ্য চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু গলি হইতে ফিরিয়া

অন্নদাপিসী যখন রাস্তায় পড়িলেন, তখন তাঁহার মুখটা পূর্বের চেয়েও প্রসন্ন। ঘোষালগিন্নির গলা ক্রমেই পর্দায় পর্দায় চড়িয়া উঠিতেছে। যখন মোড়টা ফিরিবেন একবার ঘাড়টা ফিরাইয়া পিসী দেখিলেন চাটুজ্যেগিন্নি চীৎকারের চোটে পাড়া মাথায় করিতে করিতে ধীরে ধীরে আসিয়া ষষ্ঠীতলায় গলিটার মাথায় দাড়াইলেন। পিসী তাড়াতাড়ি মোড়টা ফিরিয়া পা চালাইয়া দিলেন।

রাস্তাটা দীনু ঘোষের পুকুরের পা' া দিয়া ঘুরিয়া ডাইনে বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দির রাখিয়া আবার মোড় ফিরিয়াছে তাহার পর সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। মন্দিরের সামনেই রাস্তার অপর দিকে একটা শান বাঁধানো ঘাট। নিচের রানায় চরণ ঘোষের বিধবা বোন বাতাসী একটা কাপড়ে সাবান দিতেছে আর নিজের মনেই কি একটা কথা লইয়া গবগব করিতেছে। মেয়েটাকে পাড়ার সকলেই সাধ্যমত এড়াইয়া চলে বলিয়া সর্বদাই নিঃসঙ্গ থাকে তবে কখনও নির্বাক থাকে না। বাতাসীর নিয়ম হইতেছে সে বসিয়া কাজই করুক বা উঠিয়া চলফেরাই করুক পাশে প্রয়োজন মত একটি দুইটি বা ততোধিক মানুষ রহিয়াছে এরূপ ধরিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া চলে। কাল্পনিক মানুষের সহিত বাক্যালাপ যদি বাস্তবিক মনুষ্যে শুনিতে পায় গ্রাহ্য করে না। কেহ যদি শোনেও তো টুকিতে সাহস করে না।—বাতাসী ডাকসাইটে কুঁদুলি মেয়ে।

কেহ যদি অন্নদাপিসীর মুখের পানে চাহিত মনে করিত পিসী যেন মেঘ না চাহিতেই জল পাইয়াছেন। বাতাসী মুখ নিচু করিয়া একমনে কাপড়ে সাবান দিতেছিল পিসী মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া একটা গলা খাকারি দিলেন।

বাতাসী মুখ তুলিয়া বলিল— অনা পিসী নাকি গো? কখন এলে?'

পিসী দাড়াইয়া পড়িলেন। ঘাটের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন 'কে, বাতাসী? আমায় কিছু বললি নাকি?"

বাতাসী সাবান দেওয়া বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল 'জিগ্যেস করছিলাম কখন এলে?—এই শুনলাম তিথি করতে গেছ এক বচ্ছর এখন আসবে না—জানি না বাপু কত কথাই যে রটাতে পারে সব! খেয়ে দেয়ে কাজ তো আর নেই।"

বাতাসী হঠাৎ কান খাড়া করিয়া একটু শুনিল, জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষালগিন্নির গলা শুনছি না? ওই এক মানুষ, সকাল থেকেই আরম্ভ করেছে। কি ব্যাপার অনা-পিসী? তুমি তো ওই দিক দিয়েই আসছ।"

পিসী বলিলেন, 'থ্যামা দে বাছা খাই দাই গাজন গাই কারুর কথায় থাকি না। সমস্ত রাত জেগে শরীরটা ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে ভাবলাম গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। কে গলা বের করছে, কে ষষ্ঠীতলায় দাঁড়িয়ে কার বেটা পুত কাটছে ওসব খোঁজ রাখি না। তবে একটা কথা আসতে আসতে যেন কানে গেল—কান দিই না তবে বাতাসী বাতাসী' করছে শুনে না থাক বাছা আবার ভাববে সবাই—'

বাতাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল কি কথা বল পিসী আমার মড়া মুখ দেখ। আমি জানি বাতাসী সবার বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছে, বাতাসীর কেউ ভালো দেখতে পারে না।'

পিসী একবার চারিদিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বাতাসীর মুখের পানে চাহিলেন তাহার পর আগাইয়া গিয়া গলা খাটো করিয়া বলিলেন, "কড়া দিব্যিটা খপ্ করে দিয়ে বসলি বাতাসী, তোদের যেন কি হয়েছে!—হ্যাঁলা বেণুর সাধে ঘোষালগিন্নির পায়ে ধরে সাধাসাধি করে নিয়ে গিয়ে ভার করাবার তোর এমন কি মাথাব্যথা ধরেছিল? যশের জায়গা বড়, যশ নিতে গেছলি এখন সামলা।'

বাতাসী কাপড়টা গুটাইয়া লইয়া পাশের গাদার উপর রাখিয়া দিয়া হাত দুইটা হাঁটুর উপর রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল সুর টানিয়া বলিল "কী—বাতাসী পায়ে ধরে ভাব করাতে গেছে?—বাতাসী?

পিসী বলিলেন, আমি বললাম সে কথা বললাম সে তো থাকে না। বাপু কারুর কথায়। তা থাক বাছা রোদ এদিকে চড়চড়িয়ে উঠছে। মাথা গরম করিস নি বাতাসী ভালোর যুগ নয় তো তোরই দোষ যে লোকের উবগার করতে গেছলি। আমার নামটা আর করিস নি বাছা ব্যাগ্গতা করি নেহাৎ দিব্যি দিয়ে বললি তাই

যাইতে যাইতে বলিলেন 'আজ বিকেলে একবার আসিবি বাতাসী বদ্যিনাথের পেসাদ নিয়ে আসবি একটু।'

মোড়ের মাথায় একবার মুখটা ঘুরাইয়া দেখিলেন বাতাসী কাপড়-

চোপড় সব বাঁ হাতে জড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইযাছে। পিছন হইতে দেখিতে হইযাছে যেন একটা ফণাধরা গোখরো সাপের মত।

মোড় ফিরিতেই দেখা হইল বতনের ভাইপো গোবরার সঙ্গে। পিসী প্রশ্ন করিলেন, "তোর পিসী কোথায রে?'

কী –বাতাসী গাযে পড়ে ভাব করাতে গেছে? বাতাসী?'

গোবরা বলিল, 'এই মাত্তোর নাইতে গেলেন, গঙ্গায়।"

'মুযে আগুন, আমারই সাতপহব বেলা হয়ে গেল, পাঁচ ভূতের পাল্লায পড়ে। যত মনে কবি থাকব না এদের কথায়, তা ছাড়বে?" পিসী পা চালাইয়া দিলেন।

রতন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, পিসী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন "ওমা! বতন তুই এখানে?—আব তোব নামে ওদিকে —"

সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা উৎকট উদ্বেগেব ভাব ফুটিয়া উঠিল যে রতন পিসীব ত্বরিত প্রত্যাগমনেব কথাটাও তুলিতে ভুলিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কি কথা জেঠাইমা? আমায নিয়ে কি কথা আবার?"

পিসী বলিলেন, "থাক্ বাপু, না জানিস ভালই। পির্বাথিমিতে যে যত কম জানতে পারে সেই তত ভাগ্যবতী। বাড়ি যা।—তোব মেযেটা আছে কেমন?"

বতন ব্যাকুল আগ্রহে ধবিযা বসিল, না বলতেই হবে তোমায জেঠাইমা।"

"এই দেখ বেযাড়া জিদ মেয়ের!—তোমাব মতন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষেব কেন গাযে পড়ে পবেব অত উবগাব কবতে যাওযা বাছা? ওসব বাই ছাড।

"কি উবগাব কর্বেছি জেঠাইমা, আমাব তো—'

'কি উবগাব কবেছ তা আমিই কি জানি বাছা? সমস্ত বাত জেগে শরীরটা ভাজা হযে বযেছে, মনে কবলাম যাই একটা ডুব দিযে আসি গঙ্গায। বড বউমা বাবণও কবলে, বলে মা হাক্লান্ত হযে বযেছ, এইখেনেই তোলা জলে নেযে নাও। না তাব কথা কেটে আসতাম না হত শুনতে। ষষ্ঠী তলায এসে দেখি হাট বসে গেছে যেন। হ্যাগা, ব্যাপাব কি? কিসেব এত গণ্ডগোল এখানে? কে কাব কথা শোনে? সব অগ্নিমূর্তি হযে বযেছেন। শেষে বাতাসী ছুঁড়ী বললে বতনদিদি এই কাণ্ডটি ঘটিযেছে দুটো বাড়িতে মুখ দেখাদেখি ছিল না, পাড়া ঠাণ্ডা ছিল নিষ্কম্মা মানুষ ওঁব আব সেটা সহ্য হল না—গেলেন ভাব কবাতে—এখন সবে দাঁড়িযেছে কেন? দেখে যাক এসে—'

রতনেব সমস্ত শবীবটা হঠাৎ কঠিন হইযা উঠিল। বলিল 'বাতাসী হাবামজাদী এই কথা বলেছে?—ছোটলোকেব দুটো পযসা হযেছে কিনা! আছে সে ষষ্ঠীতলায?"

অন্নদাপিসী বলিলেন, 'থাক্ না থাক্ তুমি এখন যেতে পাববে না সেখানে বাছা।—আব আমি বলেছি এ কথা যেন বলতে যেও না ব্যাগ্যতা করছি, নেহাৎ তোকে বললে গাযে লাগে, তাই। তাও বলতুম না, জানি

অসইরন সইবাব পাত্তোর নোস্ তুই শিবুঠাকুবপোবই মেযে তো—নেহাৎ কোট করে বসলি—শুনে তবে ছাড়বি—'

পিসী গলাটা আবার খাটো কবিযা লইলেন, বলিলেন 'তবে বলতেই যখন হল—ওই ঘোষালগিন্নি মাগীই কি কম নাকি?—ভাব কবাবাব নাম করে নিয়ে গিযে কি অপমান কবিযেছিস? গলা বেব কবে জাহিব কবে বেড়াচ্ছে—আব চাটুজ্যেগিন্নিকেও নাকি কি সব বলেছিস? খল পেটে পেটে জিলিপিব প্যাঁচ?-

তিনজনেব অভিযোগে বতন যেন একেবাবে অভিভূত হইযা গিযাছিল াঁতে দাঁতে চাপিযা বলিল 'ওবা এখন আছে সবাই ওখানে জেঠাইমা?'

না কেউ নেই তুমি সোজা বাড়ি যাও। এই কডকডে বোদ্দুব াথায কবে তোমায সেখানে যেতে হবে না এখন। তুই ববং দাঁড়া আমি একটা ডুব দিযে উঠে আসছি। খববদাব যাবি নি বতন

জলে নামিবাব পূর্বে পিসী একবাব ঘুবিযা চাহিলেন দেখিলেন াটেব কাদা কাকব অগ্রাহ্য কবিযা বতন প্রায পাগলেব মত হন হন কবিয উঠিযা যাইতেছে।

স্না সাবিযা অন্নদাপিসী বা হাতে কমণ্ডলু লইযা এবং ডান হাতে মালা জপিতে জপিতে যখন ফিবিলেন ষষ্ঠীতলায তখন কান পাতা দায। গালেব মুখেব কাছে একটি বড দলেব মধ্যে দাড়াইযা ঘোষালগিন্নি ষষ্ঠী তলায একদিকে বাতাসীব সুপুষ্ট দল একদিকে বতন তাহাব সঙ্গে তাহাব নিজেব পাডাব কযেকটি মেযে ওদিকে বাডিব মেযে বউ পবিবৃতা হইযা চাটুজ্যেগিন্নি। কে কাহাব সঙ্গে ঝগডা কবিতেছে। অথবা কে কাহাব সঙ্গে বিতেছে না বোঝা শক্ত। নথেব ঝাঁকানি বিশ ত্রিশ জোড়া হাতেব বিচিত্র ঙ্গী কটু এবং কখনও অশ্রাব্য উক্তিতে ষষ্ঠীতলা গমগম কবিতেছে। াতাসীব কেবামতি একটা দেখিবাব জিনিস। সে গাছকোমব বাঁধিযা একবাব াষালগিন্নিব দলেব মোহড়া লইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুবিযা হাত পা কোমব থা নাড়িযা চাটুজ্যেগিন্নিকে যথোচিত উত্তব দিতেছে এবং পবক্ষণেই পাশে তনেব দলকে বাক্যবাণে জর্জবিত কবিযা তুলিতেছে।

অন্নদাপিসী আসিতেই সকলেই তাঁহাকে চাবিদিক থেকে সাক্ষী মানায

ব্যাপারটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল।

পিসী কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মালা জপিতে জপিতে স্থির দৃঢ় পদে ভিড়ের মধ্য দিয়া ষষ্ঠীঠাকুরের চাতালের নিকট

আবার নির্বিকার ভাবে মালা জপিতে জপিতে বাহির হইয়া গেলেন

গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কমণ্ডলুর জলটি ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিয়া আবার নির্বিকারভাবে মালা জপিতে জপিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সিগারেট

নূতন বউ বাসরঘরে যাইবার সময় তুমূলে কান্ড বাধাইয়া বসিল। কোন মতেই যাইবে না সে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয় সে শুধু বলিয়াছিল হস্টেলে সঙ্গদোষে একটা ভয়ানক বদ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে সিগারেটে গোটাকয়েক টান দিয়া সে ঢুকিবে বাসরঘরে একটি মিনিট দেরি ভিতরে গিয়া তো আর টানিতে পারিবে না।

বাসর সঙ্গিনীদের একজন চিপটেন কাটিয়া বলিল তাতেই বা ক্ষতি ক সম সাহেবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তো সবই এল একে একে— বব ড স ফ্রি ল্যাভ সিগরেট আর বেচারি সিগরেট মুখচুম্বনের অধিকার যখন পেয়েছেই তখন বাসরঘরে ঢুকতে আর দোষ কি? দু দিন পরে তো ঢুকবেই।

ক্রমে উত্তেজিত বচসা কথা কাটাকাটি। কথাটা সামান্য কিন্তু জেদা জেদির উপর একেবারে অন্যরকম দাঁড়াইয়া গেল।

অনেকে উভয় পক্ষের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। পরে যাহা হইবার হইবে আপাতত ভেতরের এ কেলেংকারিটা বাহিরে না প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু রাগ মানান গেল না। নিজের সুটকেসটা হাতে ঝুলাইয়া নূতন বধূ বাহির হইয়া পড়িল। ঢাক ঢাক সত্ত্বেও খুব একটা গোলমাল হইল কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ উপরোধ করিতে করিতে খানিকটা আসিল তাহার পর হাল ছাড়িয়া আবার ফিরিয়া গেল।

যাহাতে আবার আসিয়া কেহ উপদ্রব না করে সেই (তাড়াতাড়ি কয়েকটা গলি বদলাইয়া শেষে একটা সরু গলিতে আসিয়া পড়িল বং সেটা যেখানে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে সেই মোড়ে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের হাওয়া লাগিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক এখন কতকটা ঠান্ডা হইয়াছে বোধ হয় নিজের বেশভূষার পানে চাহিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল রাগের মাথায় কাজটা ভাল হয় নাই এই সাজসজ্জা এত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে! একবার মনে হইল পুরুষের বেশ করিয়া লয়। কিন্তু সে তো আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হয় না তাহা হইলে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়। না কস্মিন্ কালেও নয় আবার সেই জায়গায়? এত ভয়ই বা কিসের- লোকে

ছন্দ মনে করিবে একজন অতি-আধুনিকা, ব্যস্। তা করুক গিয়া মনে প্রাণ ভাবিয়া সে কেয়ার করে না।

তবে নিতান্ত নববধূর যা আভরণ - মাথার ঝাপটা হাতের রতনচুর খোঁপার কাজললতা, গলার মালা এগুলো খুলিয়া সুটকেসে রাখিয়া দিল। পাশেই একটা জলের কল ছিল মুখের চন্দনবিন্দুর রেখাগুলো মুছিয়া লইল।

এদিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনা অর্থাৎ কাজের ভাবনা মাথায় আসিয়া উদয় হইল। – হাতে একটি পয়সা নাই এদিকে ক্ষুধাও খুব পাইয়াছে। রাগে অভিমানে কাহারও কাহারও ক্ষুধা কমে কিন্তু ইহার যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

সব সমস্যার সমাধান সেই বালীগঞ্জ লেক কিন্তু সে যে এখান থেকে বহু দূর। উপায় কি? ফিরিয়া যাইবে?— ফিরিবার নামে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ছিঃ ধিক্ তাহার কলেজে পড়া আধুনিক উচ্চশিক্ষাকে, ধিক্ তাহার আত্মসম্মানজ্ঞানকে! আবার সেই জগা?

কৌতূহলী নজর পড়িতেছে — ক্রমে বেশি বেশি নিকট দূর দিয়া যেই যাইতেছে তাহারই গতি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। দুই একজনের দাঁড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ কি সব সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া দরকার হইয়া পড়িল। জায়গাটা হঠাৎ মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার এত অনুকূল হইয়া পড়িল কি করিয়া!

নূতন বধূর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল বুকের নিকট হইতে রঙিন সুগন্ধি রুমালটা বাহির করিয়া হাতে করিয়া ধরিল এবং বেশ লপেটি গোছের একজন মন্থর গমনে যেই তাহার পাশ দিয়া যাইবে আঙুল কয়টি আলগা করিয়া দিল।

আপনার রুমাল? পড়ে গিয়েছিল।"

ও, খেয়াল করি নি ভাগ্যিস আপনি দেখলেন। ধন্যবাদ।

মেনশ্যন করবেন না দয়া করে। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, তাই, —"

একটু ইতস্তত করিয়া— কোন রকম উপকার করতে পারি কি? মনে হচ্ছে যেন মানে, কারুর অপেক্ষা করছেন কি?'

একটা আঙুলের নখ কামড়াইয়া—"উপকার?—হ্যাঁ—না, "

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে—যেন বলিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও—"আপনি অনুমান করেছেন ঠিক—না বলে আমার উপায়ও নেই .. আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে এইখানে সন্ধ্যের সময় দেখা হওয়ার কথা—তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কি তাঁর মনে ছিল জানি না, কিন্তু এখন দেখছি তিনি আর এলেন না।"

'আপনাব বুমাল?—পড়ে গিয়েছিল'

হর্ষের মাঝে দুশ্চিন্তার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া--"তাহ'লে?"

ভয়ব্যাকুল ভাবে—"কি করে ফিরে যাব?--এদিককার পথঘাট কিচ্ছু জানি না, কোথায় ট্রাম, কোথায় কি—ট্যাক্সি আর গাড়িতে একলা যেতে কখন সাহস হয় না-"

"একলাই বা যাবেন কেন? যদি আপত্তি না থাকে—"

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টিতে—"অসুবিধে হবে না আপনার?

এতটা রাত হয়ে গেছে? না হলে সত্যি আমিই বা কি করব? কতক্ষণ এ অবস্থায়—?"

একটা ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেছিল, 'লপেটি' ডাকিলে ফুটপাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া শফার দুয়ার খুলিয়া দিল। নববধূ জড়িত চরণে উঠিয়া বসিল, যুবক উঠিলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "লেক রোড।.. কিন্তু আপনাকে দয়া করে একটু আগেই আমায় ছেড়ে দিতে হবে। খানিকটা হেঁটেই যাব।"

"কেন?"

সঙ্গিনী শুধু সংকুচিত ভাবে মুখের দিকে চাহিল।

তাহাতেই উত্তর পাইয়া যুবক বলিল, "ও! বেশ, যেমন আপনার অভিরুচি।" একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

মোটর উড়িয়া চলিল; মনও কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে, কতদূর কোন অজানা জগতে!

নববধূ তীব্র বায়ুস্রোত হইতে যেন রসসঞ্চয় করিয়া বলিল, "মাগো বাঁচলাম! গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছল।"

গাড়ির ঝাঁকানির সুবিধায় 'লপেটি' একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল, দরদমাখা জিজ্ঞাসু নেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তেষ্টা পেয়েছিল?"

"নাঃ।"

আবদারের সুরে—"না, নিশ্চয় পেয়েছিল, লুকোচ্ছেন।"

একটু চুপচাপ।

"বলবেন না? আর সত্যিই তো আমার জানতে চাওয়ার অধিকারই বা কি?"

"সেই চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সেই থেকে—"

"কি সর্বনাশ! সেই চারটে থেকে মুখে একটু জল দেন নি? তাই বলি—মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

একটু পরেই ট্যাক্সি গিয়া হাজরা রোডের বেশ একটি ছোট-খাট, ভদ্র অথচ নিরিবিলি হোটেলের সামনে দাঁড়াইল।

* * *

বালীগঞ্জের রাসবিহারী এভিনিউতে পরস্পরের বিদায়-দৃশ্যটি হইল বড় করুণ। 'লপেটি' হোটেলে গোপনে একটি পেগ টানিয়া লইয়াছিল, বিদায় দিবার সময় হাতের একটি সোনার আংটি খুলিয়া সঙ্গিনীর অনামিকায় পরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠ আরও গদগদ হইয়া পড়ায় বলিতে পারিল না। নব বধূটি দূরের একটা বাড়ি দেখাইয়া দিয়া নামিয়া পড়িল, তাহার পর লেক রোড ধরিয়া চলিল।

*　　　*　　　*

হস্টেলে আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড! সবার মুখে শুধু ত্রস্ত প্রশ্ন,—"আঁ! তুই এই বেশে এই এতটা পথ এলি কি করে?"

"আর ওদের প্লে শেষ হইয়া গেল? এরই মধ্যে!"

"সে কি রে! তুই বাসরঘরের সীনের আগেই চলে এলি—ঝগড়া ক'রে? বন্ধ হয়ে গেল তো তাদের প্লে?"

"অবশ্য চালিয়ে নেবেই কোন রকম করে তারা, থিয়েটার কিছু বন্ধ হবে না; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হলধরবাবু, এটা আপনার ভাল হল না মশাই।"

হলধর পরচুলটা আছড়াইয়া টেবিলে ফেলিয়া, নব বধূর বেনারসীটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, মন্তব্য পরে হবেখন; এখন তাড়াতাড়ি কেউ একটি সিগারেট ছাড় দিকিন—পেট ফুলছে, বাব্বা!"

দিল্লীকা লাড্ডু

কয়েকবার ডাকাডাকি করিতে প্রতুল বাহির হইয়া আসিল। জিজ্ঞা‌ করিলাম - "করছিলি কি? সাড়াই পাওয়া যায় না যে!"

প্রতুল - "গল্প হচ্ছিল।"

প্রশ্ন করিলাম - "এত গল্প! কার সঙ্গে রে?"

প্রতুল হাসিয়া ফেলিল — একটু লজ্জিত ভাবে। উত্তরটা পাইয়া আমি একটু ক্ষুব্ধই হইলাম, বলিলাম - "এঃ, ভারি অন্যায় করে ফেলেছি তো!.. নাঃ, আমি ফিরি, তুই যা; কে বাবা শাপ-মন্যির ভাগী হবে? এমন ফুট ফুটে শারদীয়া জ্যোৎস্না!"

প্রতুল আবার হাসিয়া আমার হাতটা ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল, বলিল — "বস্, ইয়ারকি নয়। আড্ডা দেওয়া যাক্।"

বলিলাম "জমবে না।"

"ঐখানেই জমছিল না। সরমা আর আমার মাঝখানে একটা বাঁকা প্রশ্ন এসে পড়ে সবতাতেই বড় বাধা দিচ্ছিল। এমন জ্যোৎস্নাটা লাগছিল ফিকে, আর এই হাওয়াটাকে তোরা মলয় বলিস তো এটাও তেমন যুৎ করতে পারছিল না।"

আমি আগ্রহ সরকারে বলিলাম "এমন রাসায়নিক শক্তি যে প্রশ্নের তার কথা একটু শুনতে হচ্ছে তো."

"শুনবে?" - বলিয়া প্রতুল জানালা দিয়া বাহিরে জ্যোৎস্নার দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তারপর দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল — "কলেজ যুগের কথা বলছি। ফোর্থ ইয়ারে পড়ি; হস্টেলে থেকে। আমাদের হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন থাক্ নামটা এখন বললে চলবে না। আপাতত 'শ' বাবুই বলে চালাই।

একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসার। দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসাররা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির হয়েই থাকেন। তাঁরা এত ভাবে‌ তাঁদের গড়বার সময় হয় না। আর এই গড়ার ব্যাপার থেকে সব চেয়ে বেশি বাদ পড়ে যা সব চেয়ে কাছে অর্থাৎ তাদের নিজের সত্তা। "শ ... প্রকৃতির মধ্যে উপকরণগুলি বড় ঢিলাঢালা ভাবে ছিল। একদিকে

ছিলেন গম্ভীর অন্যদিকে তেমনি ছিলেন হালকা। এক এক সময় চিন্তার গভীরতায় তাঁর তল পাওয়া যেত না, আবার এক এক সময় হয়ে পড়তেন শিশুর মতই স্বচ্ছ; তাঁর মধ্যে যে কোন গভীরতা আছে তা খুঁজেই পাওয়া যেত না। আমি ওঁর চরিত্রের মূলতত্ত্ব ধরে ফেলেছিলাম—উনি সারাজীবন ধরে অনেক ভেবেছিলেন, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারেন নি। আর তুমি জেন ভাবার সঙ্গে করার সামঞ্জস্য না ঘটলে মনের প্রকৃতি কাঁচা থেকেই যায়।

"এই ছিল ওঁর জীবনের ট্রাজেডি -এই চিন্তাশক্তির কাছে কর্মশক্তির অসহায়তা। অন্যদিকে আবার এই ট্রাজেডিই ছিল ওঁর জীবনের মাধুর্য—যা ওঁর বিরাটতর অংশের সঙ্গে আমাদের মত ক্ষুদ্রদের যোগরক্ষা করত।

"ক্লাসের মধ্যে আমি ছিলাম ওঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। তার কারণ আমি ছিলাম ওঁর দর্শনক্লাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছাত্র এবং ইতিহাসের একেবারে ফার্স্ট বয়। একটু অদ্ভুত কথা, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, অন্ততঃ প্রফেসার 'শ'যের প্রকৃতির হিসাবে। উনি সুধু চিন্তা নিয়েই কাটালেন বলে— ইতিহাসের বিরাট কর্মচাঞ্চল্য ওঁকে ভেতরে ভেতরে টানত। এই ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা ঐতিহাসিকের অর্থাৎ আমার ওপর অর্সেছিল। আমি বেশ বুঝতাম স্নেহের সঙ্গে প্রফেসার 'শ' আমায় সম্ভ্রম করতেন।

"বলতেন 'প্রতুল, মানুষ হ'য়ো অবশ্য মানুষ তুমি হবেই কেউ রুখতে পারবে না, মানুষ হবে বলেই তুমি পৃথিবীতে যাঁরা মানুষ হয়েছেন তাঁদের সঙ্গ বেছে নিয়েছ, তবুও তোমায় আমি কথাটা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতে চাই যাতে তোমার মিশন্ না ভোল। আর মিশনের যা প্রধান অন্তরায় তার কথাও তোমায় একদিন সবিস্তারে বলব। তবে তার এখন তাড়াতাড়ি নেই, বলব'খন একদিন।'

"আমি সেই সুগুপ্ত তথ্যের প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সজাগ ভাবেই অ[illegible]ব বিরাট মিশনের অনুসরণ করতে লাগলাম। দিল্লীর মত আমার [illegible] মৃত অতীতের একটা বিরাট কারখানা হয়ে উঠল।

"ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হতে লাগল, সেটাকে কবরের গায়ে গোলাপ [illegible] সঙ্গে তুলনা করতে পার; ওমর খৈয়ামের সেই লাইন ক'টা মনে আছে

"প্রফেসার 'শ'র স্নেহটা ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেটা তাঁর

বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছে গিয়েছিল। কয়েকটা ছুটিতে আমার ওঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর এমন হল যে প্রত্যেক ছুটিতেই —আগের দিকেই হোক বা শেষের দিকেই হোক আমায় ওঁর বাড়ি যেতেই হত। তারপব আবার এমন হল যে আমি ওঁর বাড়ি যাবার জন্যে হাঁ করে ছুটির দিকে চেয়ে রইতাম এবং সত্যি কথা বলতে আর লজ্জা কি, এর পরে. "

আমি হাসিয়া বলিলাম--"তোমার 'শ'বাবুকে যে চিনে ফেললাম বলে "

প্রতুল হাসিল। কহিল—"ভালই হল। তাহ'লে যাঁর জন্যে শ'বাবুকে চিনলে তাঁকে এনেই ফেলা যাক্ এই তালের মাথায়।—আমি তাঁর কন্যা সরমাকে ভালবাসলাম. এবং সত্যি কথা বলতে আর লজ্জা কি — ছুটিরদিকে হাঁ করে করে থেকে চোয়াল এতই টাটিযে উঠতে লাগল যে নিজেব হাতেই ক'টা ছুটি সৃষ্টি করে ফেলতে হল। প্রফেসর 'শ'কে বোঝালাম তাঁর শিশু পুত্রটি আমায় মায়ায় বেঁধে ফেলেছে বেশি দিন না দেখলে প্রাণ আইঢাই করে। নিজে শিশু--প্রফেসর 'শ' বেশ সহজেই কথাটা বিশ্বাস করলেন। তাঁর শিশুপুত্রের সঙ্গে একান্ত নিরুপায় হয়েই যে সময়টা কাটাতে হত, সেটাকে যে আমি নিতান্ত অপচয় বলেই মনে করতাম এই গূঢ় সত্যটা জানত সুধু সরমা। তবুও খোকাব এই মধ্যস্থতার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞই ছিলাম, আমরা উভয়েই। আমি প্রফেসর 'শ'র বাড়ি গেলেই তাব জন্যে প্রচুর উপঢৌকন নিযে যেতাম: সুতরাং খোকার টানেই যে গতায়াত বেড়ে যাচ্ছে তাতে আর কারুর--অন্তত প্রফেসর 'শ'য়ের সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

"ব্যাপার বেশ ঘোরাল হয়ে আসতে লাগল এবং সুধু ছুটিব ভরসায বসে থাকা যখন অসহনীয় হযে উঠল, তখন স্থির করলাম খোকার পাশে পাশে আরও একটি মধ্যস্থকে আসরে নামাতে হবে, তিনি গভর্নমেণ্টের ডাক-বিভাগ।—চিঠি লেখা আরম্ভ করলাম।

"সুবুদ্ধি কিছু অবশিষ্ট থাকার জন্যেই হোক বা দুঃসাহস যথেষ্ট সঞ্চিত করতে না পারার জন্যেই হোক, চিঠিগুলি ডাকবাক্সের মুখ দেখতে পেলে না, আঁতুড়েই মরতে লাগল। কিন্তু এইবার নিশ্চয় পাঠাব কপাল ঠুকে - এইরকম একটা ভাব মনে লেগে থাকায় লেখাটা বন্ধ হল না।

"সেদিন বিকেল বেলা গুমট ছিল, সন্ধ্যের পর বেশ একটু ফুরফুরে

হাওয়া উঠল। মনটা আমার হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে উঠল। সে সময়টা আমাদের নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান পড়ান হচ্ছে—গোড়ার দিকটা। আমি কিন্তু কোন মতেই অভিযানের দৃপ্ত তালে পা ফেলতে পারছিলাম না। কেন এরকমটা হচ্ছে ভাবতে গিয়ে মনে হল—সেদিনকার আবহাওয়াটা সুধু সরমাকে চিঠি লেখবার জন্য সৃষ্টি; এর প্রভাবে পড়লে নেপোলিয়নকেও সব ছেড়ে জোসেফিনকে প্রেমপত্র লিখতে হত। বই মুড়ে চিঠির প্যাডখানা টেনে নিয়ে বসলাম। খানিকটা অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় সামনের বকুল গাছের মাথার ওপর কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ উঠল। তখন ছন্দহীন, একঘেয়ে গদ্যে চিঠি লেখাটা অত্যন্ত নীরস, অশোভন এমন কি অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। সরমাকে গদ্যে চিঠি লেখা! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এতদিন লিখে এসেছি কি করে! শুষ্ক গদ্য কোন সাহসে এতদিন সরমার গণ্ডীর মধ্যে পা বাড়াবার স্পর্ধা করে এসেছে!

'চিঠিটাকে কুচি কুচি করে ফেলে দিয়ে রীতিমত কাব্য আরম্ভ করে দিলাম।

'সে সময় জোগাতোও খুব, আজকাল দেখছি স্টক ফুরিয়ে এসেছে অনেকটা। তিন পাতা শেষ করে যখন চতুর্থ পাতায় হাত দিয়েছি প্রফেসর 'শ' হঠাৎ দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এবং আমি প্যাডটা মুড়ে সরিয়ে ফেলতে পারবার আগেই এসে চেয়ারটাতে বসে পড়লেন। উনি ঐরকম এক একদিন রীতিমত টোকা মেরে ইংরেজী কায়দায় বোর্ডারের অনুমতি না নিয়ে ঢোকেন না; এক একদিন হুড়মুড়িয়ে প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েন।

"জিজ্ঞেস করলেন - ইতিহাস পড়ছ নাকি?"

"আমি বিছানায় বসে লিখছিলাম। পাশে ইতিহাসের বইটা মোড়া পড়েছিল। চোখের কোণে সেইদিকে চেয়ে বললাম— 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

"বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল।

" 'এখন নেপোলিয়ানই চলছে তোমাদের, না শেষ হয়েছে?' বললাম— 'আজ্ঞে না, চলছে—রাশিয়ান ক্যাম্পেন পড়ান হচ্ছে।'

"প্রফেসর 'শ' খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন। কিছু বললেন না, সুধু অস্ফুট স্বরে, থেমে থেমে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন—'নেপোলিয়ান... নেপোলিয়ান... নেপোলিয়ান... দ্যাট কর্সিকান ওয়াণ্ডার! (that Corsican

wonder!)

"তারপর আমি ঠিক যেই প্যাডটা সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—'প্রতুল, তোমায় অনেকবার বলেছি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায় কি তোমায় একদিন বলব . তোমার হাতের ও — প্যাডটা টেবিলে রাখতে যাচ্ছিলে বুঝি? দাও আমিই রেখে দিচ্ছি, তুমি আর উঠতে যাবে কেন?'

"তখন হার্টফেল হ'বার উপক্রম হয়েছে বললাম থাক ও, আমিই রেখে দোব'খন স্যার। হ্যাঁ কি বলবেন বলছিলেন?'

প্রফেসর 'শ' হাতটা বাড়িয়ে প্যাডটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়েই বললেন—'না, এটা একটা দুর্বলতা প্রতুল এই যে আমি তোমার প্রফেসর— গুরুস্থানীয়— আমি উঠে একটু প্যাডটা রেখে দিলেও তুমি একেবারে নরকগামী হবে এরকম মনোভাবে পরস্পরের মধ্যে ঠিক যোগ থাকে না। বোধ হয় আমার অতীন্দ্রিয় মনেও এই জিনিসটা ওয়ার্ক করছিল বলে তোমায় অমন দরকারী কথাটা এতদিন বলে উঠতে পারি নি' বলে আবার অন্য মনস্ক হয়ে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। হাতের প্যাডটা হাতেই রইল। আমার তখন কালঘাম ছুটছে।

"একটু পরে আবার হঠাৎ ফিরে স্থির দৃষ্টিতে একটু চাইলেন মনে হল যেন কি একটা স্থিরনিশ্চয় করে বসে যেন নিজের মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করলেন, তারপরেই গড় গড় করে এক নিশ্বাসেই সমস্ত কথাটা বলে গেলেন।—

"বললেন— 'প্রতুল, বিবাহ ক'র না কখন। অবশ্য বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি জানি না, হতে পারে তোমার মত ছেলে আমার পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে এর বিরুদ্ধে আগে থেকেই মনস্থির করে ফেলেছে, তবুও কর্তব্য হিসাবে কথাটা বললাম। স্ত্রীজাতি একটা মোহ এবং জীবনের একটা সময়ে এই মোহটা মারাত্মকরকম প্রবল থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এটা জীবনের সেই সময় যখন অন্যদিক থেকে জীবনের যা কিছু সুন্দর, সত্য, মহৎ, বিরাট—সব এসে আমাদের মনে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। জীবনের সেটাকে সীড্-টাইম (seed-time) বলতে পার। যদি মোহ কাটাতে পার সুন্দরকে পাবে, বিরাটকে লাভ করবে; কিন্তু প্রকৃতির এমন

ষড়যন্ত্র মোহটা যে মোহ—সেটা ধরা পড়ে যখন সময়টা উৎরে যায়, যখন অবশিষ্ট থাকে সুধু অনুশোচনা—সারা জীবনব্যাপী ব্যর্থতার আপশোষ। এই জন্য বিবাহ ব্যাপারটাকে হাস্যচ্ছলে বলা হয়েছে দিল্লীকা লাড্ডু। জিনিসটা কি তা কেউ জানে না; তবে কথাটার মানে যদি হয়—যে পেলে সেও পস্তালে, যে না পেলে সেও পস্তালে, তাহ'লে কথাটা ভাল্‌গার (vulgar) শোনালেও খুব যে এক্সপ্রেসিভ্‌ (expressive) তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি আজ তোমার আমার মধ্যে প্রফেসর ছাত্রের ব্যবধান রক্ষা করে কথা বলছি না, তাই কথাটা বন্ধু বন্ধুকে যতটা স্পষ্টভাবে বলতে পারে সেই ভাবেই বলছি। মূল সত্যগুলি সম্বন্ধে এই সুহৃদ-ভাবটা আনতে পারছি না বলেই আমরা এ পর্যন্ত পৃথিবীকে যতটা বড় করতে পারতাম—পারা উচিত ছিল, তা পারি নি।—মানে আমাদের অভিজ্ঞতা তোমাদের অকুণ্ঠ চিত্তে দিতে পারি নি। আমি আজ দোব।

"'প্রতুল, আমার সম্বন্ধেও আমার অভিভাবক আর প্রফেসরদের খুব উঁচু আশা ছিল—আমার তো ছিলই। ক্রমাগত স্কলারশিপ—রেকর্ড মার্ক, গোল্ড মেডেল একচেটে করে ফেললে আশা না থেকে উপায় কি? এমন সময় ভেতরে ভেতরে যে মোহের কথা তোমায় বলতে...'

"ঠিক এই সময় একটা হাওয়ার ঝটকা এসে প্যাডের পাতাগুলো ঝর্‌ঝরিয়ে একবার উল্টে দিলে। প্রফেসর 'শ' খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন—চোখ মুখ আবেগে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ খোলা প্যাডের দিকে নজর পড়ায় একেবারে যেন নিভে গেলেন। প্রায় মগ্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন—'পদ্য লিখছিলে প্রতুল,—তুমি!"

তবু কি মানুষ আশা ছাড়তে পারে? বিশেষ করে ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে যার নাম লেখা থাকবে তার সম্বন্ধে? প্রফেসর 'শ' আমার মুখের দিকে একটু টেনে-রাখা-আশার দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—'নেপোলিয়ানের ক্যাম্পেনটা (campaign) ব্ল্যাংক-ভার্সে (blank-verse) লেখবার চেষ্টা করছ বুঝি?'

"আমি তখন একেবারে মরিয়া হয়ে গেছি। একটু হাসবার চেষ্টা করে হাতটা বাড়িয়ে বললাম—'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তবে একেবারেই হচ্ছে না, দিন...'

"'না হোক্, তবু একটা উ'চুদবের ভাব নেপোলিয়ানেব বুশ ক্যাম্পেন্!—বিরাট ট্রাজেডি! দাঁড়াও দেখি একটু কেমন হচ্ছে, তোমার হাতে নিতান্তই খারাপ হবে না।'—ব'লে প'ড়ে যেতে লাগলেন। শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম মুখটা তাঁব ক্রমেই যেন ছাইযের মত ফ্যাকাশে হযে

দাঁড়াও দেখি একটু নেপোলিযানেব বুশ ক্যাম্পেন!

আসছে। ষোল কি সতের লাইনে সবমাব নাম ছিল। বোধ হয সেই পর্যন্ত এসেই প্যাডটা বেখে দিযে আমায আব কথাটি মাত্র না বলে অবসন্ন মন্থব গতিতে ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন।'

প্রতুল থামিল, জানলা দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি প্রশ্ন করিলাম—"তারপর?"

প্রতুল বলিল—"তারপর তো তুমি জানই। বি-এ পরীক্ষায় যে-ছেলের সর্বোচ্চ স্থান বাঁধা, বাঙালীর বিবাহ-বাজারে সে পরম কাম্য। কিন্তু একথা আমি এখন পর্যন্ত মনে মনে জানি প্রফেসর 'শ' খুব নিরাশ হয়েছেন; তিনি যে এখন আমায় স্নেহ করেন—জামাতা হিসেবে নিশ্চয় একটু বেশিই করেন—তার মধ্যে কিন্তু অনুকম্পার খাদ মেশান আছে।

"কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। আজ সেই দিনের মত জ্যোৎস্না—সেই দিনের মলয়। এখন সরমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বড় ভাল লাগছিল সরমাকে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তির্যকভাবে দুজনের মাঝখানে ঠেলে উঠছিল—এই সরমা—জ্যোৎস্নার অভাবে যে আমার জীবনের জ্যোৎস্না—আর এমন জ্যোৎস্নার মাঝে যার মাধুর্যের তলই পাওয়া যায় না—তার সম্বন্ধেও কি কোনদিন আমায় বলতে হবে—'দিল্লীকা লাড্ডু পেয়েও অনুশোচনাই সার হলো?' এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?'"

আমি হাসিয়া বলিলাম "সুধু উত্তর খুঁজে বেড়াবার জন্যেই কি জীবন সৃষ্টি হয়েছিল প্রতুল? অন্তত আমার উত্তর আপাতত এই যে—এখনও জ্যোৎস্না আর হাওয়া দুই-ই রয়েছে, অতএব আমি উঠি।"

প্রশ্ন

উপল-মুখরা, স্বচ্ছতোয়া ভদ্রার কূলে বৌদ্ধগুরু ভগবান সোমদত্তের আশ্রম। পশ্চাতে অনন্তবিস্তারী শালবন, দিবসেও গোধূলির ন্যায় স্নিগ্ধ, মৌন; তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সম্মুখে নগাধিরাজ তুঙ্গচূড়; শুভ্র যজ্ঞোপবীতের মত ভদ্রা তাহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আশ্রমের পাদদেশ ধৌত করিয়া নৃত্যপরা বঙ্কিম গতিতে বন হইতে বনান্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আশ্রমটি জনবিরল। ভগবান স্বয়ং এবং তাঁহার দ্বাদশ-সংখ্যক শিষ্য,—মনুষ্য বলিতে প্রায় এই। এই বিরলতা অনেকটা পূর্ণ করিয়াছে মনুষ্যেতর নানাবিধ জীবের সমাগমে। তটভূমি যেমন বিক্ষুব্ধ ঊর্মিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার বিক্ষোভ নষ্ট করে, এই আত্মসমাহিত আশ্রমও তেমনি মুক্ত প্রকৃতির হিংসা-ভীতিসংক্ষুব্ধ জীবনিচয়কে আপন অঙ্কে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমস্ত অসমতা, সমস্ত বিরোধ তাবৎকালের জন্য বিদূরিত করিয়া দেয়। ভগবানের মানসকন্দর হইতে যেন এক স্নিগ্ধ মাতৃভাব উৎসারিত হইয়া সমস্ত আশ্রমটিকে ছাইয়া আছে; শ্রমক্লিষ্ট শিশুর মত সেই অমৃতের জন্যই যেন জীবকুল লালায়িত হইয়া আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়া আসে। বাহিরে প্রাণধর্মের শত বিক্ষোভ,—হেথায় স্নিগ্ধ শান্তি, তৃপ্ত বিস্মরণ।

এ ব্যতীত আর একটি জীব এই আশ্রমের মধ্যে আছে। তাহার একটু পৃথকভাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত, কেননা তাহার মনুষ্যের আকৃতির সঙ্গে আরণ্যক প্রকৃতি এমন ভাবে মিলিয়াছে যে তাহাকে কোন পর্যায়েই ঠিক ভাবে ফেলা যায় না।

সে চারুদত্তা, ভগবান সোমদত্তের পালিতা কন্যা। চারুদত্তার পূর্ব ইতিহাস কিছু রহস্যময়। এসম্বন্ধে অনেকগুলি জনশ্রুতিই আশ্রমের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া পরস্পরকে সংশয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। শিষ্যদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস চারুদত্তা পিতৃ-মাতৃহীনা গৃহস্থকন্যা, সমীপবর্তী কোন গ্রাম হইতে ভগবান করুণাপরবশ হইয়া লইয়া আসেন। গুরুর প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিষ্যেরা বলে—চারুদত্তা ভগবানের মানসকন্যা, তাঁহার

ইচ্ছাসম্ভূতা। যাহারা একটু চটুল এবং বিশ্বাস আর অভিমতের মধ্যে দুঃসাহসিকতা রাখে তাহারা প্রচার করে চারুদত্তা জন্মগৌরবে শকুন্তলা। বিন্ধ্যারণ্যের কে এক আচার্য ঔপালিক এক সময় এক পার্বত্য তরুণীর নিকট যোগভ্রষ্ট হন এবং তাহার পর উগ্রতর বৈরাগ্যে আশ্রমত্যাগ করেন। চারুদত্তা সেই তপস্খলনের সাক্ষ্য। যাহা হউক স্বল্পবাক্ শিষ্যেরা এ'লইয়া অধিক বাক্য বিনিময় করে না, গুরুর নিকট কখন কোন প্রশ্ন উঠে নাই, তিনিও এ বিষয়ে মৌন। আর বন্য-হরিণীর জন্ম-পরিচয়ের জন্য কেইবা কবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে? সে যে আছে, গিরি-বন-প্রান্তরকে তাহার অবাধ, মুক্ত জীবন দিয়া পূর্ণ করিয়া আছে, এই তাহার জীবনের চরম সত্য। তাহার কৃষ্ণায়ত চক্ষু, সুকৃশ অঙ্গ-ষষ্টী যে প্রাণের প্রাচুর্যে সদা উচ্ছল এই পরিচয়ই তাহার সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে; সেই চক্ষু, সেই কশ-অঙ্গের উদ্ভব কোথায়, কোন প্রদীপ থেকে তাহার প্রাণের দীপ জ্বালা সে কথা কি অল্পবিস্তর অবান্তরই নয়?

আশ্রমের সংযত পরিসরের মধ্যে সে কুলাইয়া উঠে না; তাই তুঙ্গচূড়ের শিখর হইতে শালবনের গহন গভীরতা পর্যন্ত এক বিরাট অনির্দেশ্য ভূভাগে সে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। বলা যাইতে পারে ওটা বন্যমৃগী চারুদত্তার স্বৈরচারণ ভূমি। বায়ুর মত সে সর্বত্র-গতি। কখন দেখা যায় পর্বতের বন্ধুর গাত্র বাহিয়া চলিয়াছে, একা কিংবা হয়ত একপাল আশ্রমপশু পরিবৃতা. উদ্দেশ্য হয়ত মৃগয়া কিংবা সুধুই এমনি একটা নিরুদ্দিষ্ট অভিযান। কখন সঙ্গিনী তাহার স্রোতস্বিনী ভদ্রা;--বক্ষে বক্ষ রাখিয়া দুই সখীর নর্ম-ক্রীড়া চলিয়াছে— উচ্ছ্বসিত কলকাকলীতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত, উৎক্ষিপ্ত শিরকমুষ্ঠিতে বাতাস অভিষিক্ত।... কখন সে নিষ্ঠুরা, তাহার ধমনীতে বুঝি তাহার কোন্ বন্যমাতার রক্ত নাচিয়া উঠে, বনকান্তার আলোড়িত করিয়া তাহার সংহারের জয়যাত্রা চলে।... কখন বা প্রকৃতি নিজেই যখন উদ্দাম,—নিদাঘের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ঊর্মিবিক্ষুব্ধ মৃত্যুস্রোতের মত প্রবল ঝঞ্ঝা গর্জিয়া ছোটে, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম বিফল আর্তনাদে বনভূমি মথিত করিয়া তোলে, চারুদত্তা বহু-সন্তানবতী বিপন্না জননীর মতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে—কোথায় তাহার নিজের হাতে বৃক্ষলগ্নকরা লত' আশ্রয়চ্যুত—কোথায় নীড়ভ্রষ্ট শাবক অন্ধ আতঙ্কে মাতৃবক্ষ অন্বেষণ করে--

বনপর্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হইতে কত সব অনির্ধারিত ব্যথার আর্তনাদ উঠে,—চারুদত্তার কিশোর বক্ষতটে এ সবের প্রতিঘাত জাগে, অসহায় করুণায় চক্ষু দুইটি স্থির করিয়া এই দস্যুবৃত্ত ঝটিকার পানে চাহিয়া থাকে। প্রকৃতি যখন শান্ত হয় চারুদত্তা তাহার মূর্চ্ছিত বনপরিবারের দেহে মমতার প্রলেপ মাখাইয়া ফিরিতে থাকে। ..পরের দিন হয়ত সে নিজেই আবার চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল একটা ক্ষুদ্র ঝটিকা।

(২)

একদা অপরাহ্ন সময়ে শিষ্যপরিবৃত ভগবান সোমদত্ত পিয়াল-ছায়ে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন এমন সময় আশ্রমসীমায় এক সুদৃশ্য অশ্বরথ আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে ভদ্রবেশ পরিহিত এক সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় অবতরণ করিলেন। সঙ্গে অনুমান অষ্টাদশবর্ষীয় প্রিয়-দর্শন একটি যুবা। ভগবান ব্যস্তসমস্তে অগ্রসর হইয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন এবং শিষ্যকর্তৃক বিস্তৃত আসন গ্রহণ করিলে প্রৌঢ়ের বদনে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরিচয় ও কুশলক্ষেমাদি প্রশ্ন করিলেন। প্রৌঢ় বলিলেন -"ভদন্ত, আপনার এ সেবক দুর্ধর্ষ হূনদিগের পরাভবকারী সুসঙ্গাধিপ প্রজারঞ্জন মহারাজ সূর্যসেনের নগরামাত্য নাম বাণভদ্র। ভগবৎ কৃপায় রাজানুগ্রহ প্রভৃতি সুধীকথিত ষট্‌সম্পদে সম্পন্ন হইয়াও সম্প্রতি আমি দারুণ মানসিক চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সুখভ্রষ্ট হইয়াছি। আপনার দাসানুদাস এই কিশোর আমার একমাত্র তনয়। এর দৈহিক কান্তি ও অলৌকিক ধীশক্তি এতাবৎ আমার পরম আনন্দ ও তৃপ্তির হেতুভূত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহাতে আমরা সকলেই কুমারের ভাবী ঐহিক জীবন ও তদনন্তর পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। কুমার লিখন পঠন এবং মননের দ্বারা কাব্যানুশীলনে ব্রতী হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার আচরণে আনুষঙ্গিক বিকার পরিলক্ষিত হইতেছে। হে মহাপ্রাণ, ধর্মাচার্যগণ বলেন কবিবৃত্তি সাতিশয় লঘুবৃত্তি। প্রাকৃতিক ও মানসিক ব্যাপারে যাহা কিছু অলীক ও অস্থায়ী, সৌন্দর্যের

মোহজনক নামে অভিহিত হইয়া যাহা সত্যকে অবলুপ্ত করিয়া দাঁড়ায় সেই সমস্তকেই আশ্রয় করিয়া এই বৃত্তি জাগিয়া উঠে বলিয়া ইহা চিত্তের দার্ঢ বিনষ্ট করে মাত্র এবং সেই হেতু লৌকিক পারত্রিক উভয়বিধ সাফল্যেরই অন্তরায়। নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক বিলাসপ্রবণতা সাধারণভাবে এই বৃত্তির অনুকূল, তদুপরি পৌরসুধিগণ প্রশংসার ইন্ধন দিয়া ইহাকে আরও উদ্দীপিত করিয়া তোলেন। সুতরাং নগরবাস এবং পৌরভাবাপন্ন শিক্ষা কুমারের পক্ষে অহিতকর জানিয়া আমি আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি, এই আশায় যে আপনি আপনার পুণ্য জ্ঞানালোকের দ্বারা ইহার মতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ঐহিক পারলৌকিক সর্ববিধ কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কাব্যভাবাপন্ন কুমারের মতি এখন রাহু-কবলিত চন্দ্রের মত মলিন ও কলুষিত। হে সুধীসত্তম, এক্ষণে আপনি ইহাকে শিষ্যত্বে বৃত করিয়া আমার আশা সফল করুন, কুমারের প্রতিভাকে সার্থকতা দান করুন আপনার প্রদীপ্ত যশোরশ্মিকে আরও সুদূর-প্রসারিত করুন।"

সোমদত্ত কুমারকে স্মিতহাস্যে সাদর আহবান করিয়া আপন বামপার্শ্বে বসাইয়া তাহার শিরচুম্বন করিলেন, তদনন্তর তাহার পৃষ্ঠে বামকর ন্যস্ত করিয়া বাণভদ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন "মহাত্মন, আপনার এই পুত্র যে ধীমান এবং শীলবান তাহা তাহার আকৃতি সম্যক পরিচিত করিতেছে এবং কুমারকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আমি অভূতপূর্ব আনন্দই লাভ করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কুমার যৌবনসীমায় উপনীত, তাহা ভিন্ন তাহার কবিপ্রকৃতি চিত্তের মুক্তি সূচিত করে; এ অবস্থায় নববিধ জীবনধারা আরম্ভ করিবার পূর্বে কুমারের অভিমত লওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। হে নরবর, ধর্মই মানবজীবনের পরমবস্তু বটে, কিন্তু যতদিন কোনও বাসনা দ্বারা চিত্তের প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ অথবা সংকীর্ণ হইয়া থাকে ততদিন বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মের প্রবেশ ঘটাইবার চেষ্টা শুধু বিড়ম্বনাই নয়, অধিকন্তু বিপজ্জনক। ভগবান বুদ্ধপ্রমুখ সকলেরই প্রথমে সাক্ষাৎ ভোগের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকার চিত্তবিকার হেতু কঠোর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। পরে সেই বৈরাগ্যমার্জিত পথে পরমধর্মের প্রবেশ ঘটে।"

বাণভদ্র উত্তর করিলেন--"হে ভদন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সহিত আচরণে আমি ভগবান কৌটিল্যের নীতি অনুসরণ করি। তাহা ভিন্ন কাব্যানুশীলন

লঘু বৃত্তি হইলেও হীন বা গর্হিত নয় যে কোনরূপ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কুমারকে বিরত করিতে হইবে। আমি পূর্বেই যথাবিহিত তাহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। সুজাতক নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছানুসারে কাব্যানুশীলনে বিরত হইয়াছে। বস্তুত সে অনুতপ্ত, এবং তাহার চিত্ত এই অনুতাপের অনলে দগ্ধ এবং নির্মল হইয়াই মহদ্ধর্মাভিষেকের অধিকতর উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। হে মহামতি, চিত্তের শুদ্ধির এই মহাশুভক্ষণে আপনি কুমারকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করুন।"

(৩)

নদী যেমন সাগরের মধ্যে আত্মবিলীন হয়, গন্ধ যেমন বায়ুর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দেয়, সাধ্বী যেমন নিজের দয়িতের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে, সুজাতক কায়মনোবাক্যে সেইরূপ নিজেকে ধর্মের মধ্যে রিক্ত করিয়া দিতে মনস্থ করিল। সোমদত্ত বলিয়াছিলেন তাহার কবিপ্রকৃতি চিত্তের মুক্তি সূচিত করে। সুজাতক আত্মচিন্তার দ্বারা সত্বরই উপলব্ধি করিল, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এ মুক্তি কি বাঞ্ছনীয়? মানুষের জীবনের চারিদিকে এই যে সীমার পর সীমার শুভবন্ধনী, – শাস্ত্রের সীমা, সমাজের সীমা, সহস্রবিধ প্রয়োজনের সীমা, অসম্ভাবনাকে বাহিরে ফেলিয়া সম্ভাবনার সীমা--জীবনকে কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই যে সবের সৃষ্টি সে সব কিছুই সে মানে নাই। তাহার মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের চেয়েও অবাধ মুক্তিতে সৌন্দর্যের এক অর্থহীন কল্পলোকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,- সৌন্দর্যের কল্পলোকে, যেখানে এই ধরণীর সব অসারতা, সব সামান্যতা সব দীনতাও তাহার নিজের মনের রঙীন আলোকে, তাহার নিজের সৃষ্ট মূঢ় বিস্ময়ের মধ্যে অলোকসামান্য সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজ চিত্ত তাহার প্রবুদ্ধ। সে বুঝিয়াছে, ঐ মুক্তি ছিল মিথ্যা— ও থেকে মুক্তি চাই, পরিত্রাণ চাই। এই পৃথিবী কঠিন সত্যে পূর্ণ; এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বিরাট অনধিগত সত্য।...সমস্ত মনকে প্রতিজ্ঞায় কঠোর করিয়া সুজাতক বলে, "আমি ধর্মের শরণাপন্ন হইলাম।... অপব্যয়িত

জীবনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব,—জীবনের এই ব্যর্থ অংশকে নির্মম ভাবে অস্বীকার করিয়া আমার সমগ্র জীবন থেকে ওকে নিরবশেষ ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া।"

কবি সুজাতক শাস্ত্রের গহন কাননে প্রবেশ করিল।

তীক্ষ্ম মেধা, কঠোর অধ্যবসায় সাফল্যকে দিন দিন করায়ত্ব করিয়া আনিতেছে। কবির কৌতুক-চঞ্চল নয়নে জ্ঞানে দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের শান্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য সকলের পক্ষে যেমন বাহ্য পরিবর্তনটা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সে নিজেও বুঝিতে পারিল সে সিদ্ধির পথে সুনিশ্চিত ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অনুভব করিল তাহার জগতের উপর থেকে মায়ার আবরণটা খসিয়া পড়িয়া জগৎ তাহার কাছে দিন দিন রূঢ়, কঠোর সত্যরূপে জাগিয়া উঠিতেছে। বুঝিল — এই আকাশ, এই নদনদীপ্রান্তর, লতাগুল্মবৃক্ষ, পত্রপুষ্পকিশলয়, এই মানব জীবন—শৈশব যৌবন জরায়, সুখে দুঃখে বিচিত্র - - এসবের উপর এতদিন কিসের একটা আবরণ ছিল কি একটা মিথ্যা আলোর প্রলেপ, তাই এতদিন বোঝা যায় নাই, তাই এতদিন পৃথিবী ছিল অপার্থিব। আজ বোঝা যাইতেছে — সব স্পষ্ট, রুক্ষ, দীন - প্রত্যক্ষ যতটুকু, ততটুকুই — তাহার তিলমাত্র বেশি কিছু নয়।

ধর্ম বলেন এ সব যতটুকু প্রত্যক্ষ ঠিক ততটুকুও সত্য নয়। ইন্দ্রিয়ের ক্ষণভঙ্গুর বুদ্বুদের গায়ে ক্ষণিকের চপল বর্ণবিন্যাস মাত্র। সব মায়া। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ এক মহাশূন্যের বিকার। হে মুক্তিকামী জীব, তুমি জ্ঞানশলাকা দ্বারা তোমার অন্তর্জগৎ আর এই শূন্যাত্মক বহির্জগৎ দিয়া গড়া, এই মায়ার বুদ্বুদ বিদ্ধ কর। তবেই তোমার প্রতিষ্ঠা—তাহাতেই তোমার আকাঙ্ক্ষাহীন চিত্ত বর্ণমলিনতাহীন মহা জ্যোতির্লোকে পরম বিলুপ্তি লাভ করিবে। সেই অবোধগম্য মহানির্বাণই তোমার তপস্যা হোক।

সুজাতক ধর্মকে আশ্রয় করিল, এই মহাবিলয়কে জীবনের সাধনা করিল, এই তপস্যার অনলে, জীবনে যাহা কিছু আজ পর্যন্ত পরম কাম্য বলিয়া সঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, সমস্তই অঞ্জলি ভরিয়া আহুতি দিতে লাগিল।

দিন দিন সে আশ্রমে বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীর্থেরা স্তব্ধ

সম্ভ্রমের দ্বারা এবং গুরু প্রগাঢ় প্রীতি, মৌন প্রশংস দৃষ্টি এবং সর্বোপরি সখ্য ভাবের দ্বারা তাহার বিশিষ্টতাকে সম্বর্ধিত করিলেন। শুধু একস্থানে এর ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল।—

চারুদত্তার আচরণে সুজাতকের ক্রমবর্ধমান গাম্ভীর্য কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না। অথবা আরও সত্য রূপে বলা চলে, যে পরিবর্তনটুকু ঘটাইল তাহা তাহার গাম্ভীর্যকে মর্যাদা না দিয়া বরং লাঘব করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইতে লাগিল।

সুজাতক কোন আশ্রমতরুতলে শীলাসনে বসিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, চারুদত্তা আসিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার দাঁড়ানর ভঙ্গিমায় এবং ব্যবধানরক্ষায় বেশ একটি সম্ভ্রমেব ভার পরিস্ফুট, কিন্তু সেটি কপট সম্ভ্রম-অভিনয়, এবং অভিনয়-যে সুজাতক তাহা জানে। একবার চাহিয়া দেখিয়া আবার অধ্যয়নে নিরত হয়। চারুদত্তা আগাইয়া আসে তাহার সঙ্গে তাহার পার্শ্বচরবৃন্দ--কয়েকটি সারমেয়, এক মৃগ দম্পতি, একটি চক্র-শৃঙ্গ দীর্ঘশ্মশ্রু বন্যছাগী। চারুদত্তাকে ঘিরিয়া সবগুলি তাহার লক্ষ্য সুজাতকের পানে চাহিয়া থাকে। সুজাতক একটু বিব্রত হয় এবং যদিও তাহার মন গ্রন্থচ্যুত হইয়া পড়ে তথাপি সে তাহার দৃষ্টি তাহাতে সমস্ত শক্তি দিয়া নিবদ্ধ রাখে।

চারুদত্তা বলে- "কুমার, আমরা সকলেই ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। শ্মশ্রুমুখী এই ছাগী বলিল -'ক্লান্তি অপনোদনের উৎকৃষ্ট উপায় শাস্ত্রশ্রবণ, কেননা শুনো যায়--শাস্ত্র সংসারের বৃহত্তর দুঃখ ক্লেশকেও নষ্ট করিতে সক্ষম--অতএব.."

ছাগীর ঘূর্ণিত শৃঙ্গের মধ্যে লঘুভাবে হস্ত চালনা করিয়া সশব্দে হাসিয়া ওঠে।

সুজাতকের শাস্ত্রে অভিনিবেশ, এই প্রখর হাস্যে একেবারে যেন শত-খণ্ডিত হইয়া যায়। বৃথা প্রয়াস, এই বর্বর প্রকৃতি-দুহিতার কাছে পরিত্রাণ নাই। বরং বিলম্বে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায়, মর্যাদায় আরও আঘাত দিবে। সুজাতক গ্রন্থ রুদ্ধ করিয়া বোধ হয় হাসিয়া বলে---"অয়ি প্রগল্‌ভে, শাস্ত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ তুমি খুব সদ্গুরুর নিকটই পাইয়াছ--উহার দীর্ঘ পক্ক

শ্মশ্রু, শৃঙ্গরূপী জটিল জটা এবং সর্বোপরি গম্ভীর দৃষ্টি—সমস্তই গভীর তত্ত্বজ্ঞান সূচিত করে। উঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই অযোগ্য শিক্ষার্থীকে শাস্ত্রপাঠের অনুরোধ করিয়া উঁহার অবমাননা করিলে মাত্র। এ গুরু-অবজ্ঞা অমার্জনীয়।"

জাতিগত অভ্যাসমত ছাগী কখনও কখনও বোধ হয় এইরূপ মন্তব্যের শেষে একটা কম্পিত হ্রস্বধ্বনি করে। মনে হয় সে সুজাতকের বাক্য আগ্রহ-ভবে সমর্থন করিল, অর্থাৎ সে সত্যই অসম্মানিত, শাস্ত্র পাঠ তাহারই শোভা পায়।

উভয়েই হাস্য করিয়া ওঠে, তাহার পর আলাপের স্রোত দিক পরিবর্তন করে। শ্রোতা সুজাতক, বক্তা চারুদত্তা, কেননা সে বাক্যে চপল এবং সুপটু, তাহার জীবনক্ষেত্র সুপ্রসারিত, এবং তাহার অভিজ্ঞতা প্রতিদিনের নানাবিধ ঘটনা দ্বারা সুসমৃদ্ধ, নিত্য নূতন এবং প্রত্যক্ষতায় সজীব। মৃগয়ার কথা, ভিলেদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনের কাহিনী এক এক সময় দৃষ্টিপথের অতীত বিস্তীর্ণতর জগতের কথা তোলে, বলে "কুমার, তোমাদের আশ্রমবাসীদিগের বোধ হয় মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে তুঙ্গচূড়ের চেয়ে বড় কিছুই নাই। ও সমস্ত দক্ষিণ ভাগটা এমনি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যে তোমাদের ধারণার দোষও দেওয়া যায় না এমন কি ওর পরে যে আরও কিছু আছে এ কখনও বোধ হয় তোমাদের বিশ্বাস হয় না, অন্তত আমার তো এক সময় হইতই না। একদিন কৌতূহলবশে আমি সমস্ত দ্বিপ্রহর ধরিয়া আমার সারমেয় চারিটি লইয়া তুঙ্গচূড়ের শিখরে আরোহণ করিলাম। ঐ যে শিখরদেশে ক্ষুদ্র বৃক্ষ এখান হইতে দেখা যাইতেছে উহার ছায়াতলে গিয়া বসিলাম। ওখান হইতে দেখা যায় উহার অপর দিকে জলহীন বিশাল পুষ্করিণীর মত এক প্রাঙ্গণ। সেখানে একেবারে বৃক্ষাদি নাই, শুধু ভদ্রার ক্ষীণ চপল ধারা বক্রগতিতে বহিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্র সমস্ত স্থানটিকে ভরিয়া দিয়া অস্পষ্ট জলের মত কাঁপিতে থাকে। পিতা বলেন উহাই নাকি মরীচিকা, আমি প্রলুব্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে পারিতাম বলিয়া পিতা অতিশয় তিরস্কার করেন। তোমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে মরিলে লোকে প্রাণ হারায় না!—আছে না এমন অদ্ভুত কথা কুমার?"

সুজাতক সে কথার উত্তর না দিয়া তুঙ্গচূড়ের পানে একপ্রকার উদাস

করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করে—"সেই প্রাঙ্গণের পারে কি আছে?"

"হ্যাঁ,—তাহার পর আছে অসংখ্য গাঢ় নীল পর্বত। বহু দূরে: দেখায় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু আমি পার্বত্যদের মুখে শুনিয়াছি ওগুলা সবই তুঙ্গচূড়ের চেয়ে উচ্চ।...আমায় পার্বত্যরা কি বলে বল দেখি? . বলে--পাহাড়ী ঝরণা!"

একটি তরল, দ্রুত হাস্য করিয়া ওঠে, বলে "অদ্ভুত নাম নয় কুমার? লোকে মনে করিবে এ কন্যা..."

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে—"কুমার, তোমার সতর্ক থাকাই ভাল। এখনই হয়তো আমি ভদ্রার মত জলোচ্ছ্বাসে তোমায় সিক্ত করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিব, কিংবা তোমায় নিতান্ত এক তৃণখণ্ডের মতই ভাসাইয়া লইয়া যাইব—কোথায় থাকিবে তোমার তপস্যা, তোমার গ্রন্থ..."

গাম্ভীর্য ভাঙ্গিয়া আবার হাসির হিল্লোল ওঠে।

আবার সহজভাবে গল্প চলিতে থাকে,--ভদ্রার ঝরণার কথা "ভিলদের মুখে শোনা গল্প--অধিত্যকার ওদিকে নীলপর্বতপুঞ্জের মধ্যে বহু দূরে কোন্ এক স্থানে ভদ্রার জন্ম। ভিলেরা বলে সে নাকি এক অতি দুর্গম কিন্তু অপরূপ স্থান। ভিলেদের দেবতারা সুরসুন্দরীদের সঙ্গে সেখানে নাকি শিশুভদ্রার পবিত্র জলে নিতাই স্নান করিতে আসেন। কথাটা তোমার বিশ্বাস হয় কুমার? আমার তো কই হয় না। দেবতাদের তো স্বর্গেই তাঁহাদের জন্য নদনদী বর্তমান, পৃথিবীর জিনিস কি এত সুন্দর কখনও হয় যে দেবতারাও লোভের বশে নামিয়া আসিবেন?"

হঠাৎ কৌতুকচ্ছটায় মুখটা দীপ্ত হইয়া ওঠে। "দেখ কেমন অদ্ভুত কথা কুমার! দেবতারা পৃথিবীর সুন্দর জিনিসের জন্য স্বর্গছাড়া, আবার এদিকে মানুষ স্বর্গের মধ্যে কি সৌন্দর্য আছে না আছে তাহার জন্য পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, সব আনন্দ ছাড়িয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যস্ত! তোমার এটা খুব আশ্চর্য বোধ হয় না কুমার?"

সুজাতকের মন যেন হঠাৎ কোথায় পথ হারাইয়া গেছে, শূন্যবদ্ধ দৃষ্টি যেন তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে .

চারুদত্তা হাসি-গম্ভীরতায় মিশাইয়া কপট অনুনয়ের সহিত বলে—"দেবতাদের ভুল ধরিতে গিয়া এই দেখ আমার নিজের ভুল!—আমি আবার

উলটিয়া তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি—যে নিজেই পৃথিবীর সব ছাড়িয়া স্বর্গের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত।...না কুমার, আমায় ক্ষমা কর, সত্যই তো পৃথিবীতে আবার কি সুন্দর আছে?...আমার এই ছাগসুন্দরীই তাহার সাক্ষ্য দেখনা। ক্ষমা করিলে তো?"

কৌতুকে উচ্ছল হইয়া ওঠে; দুষ্ট ভঙ্গীতে শিরশ্চালন করিয়া বলে—"তাহা হইলে কিন্তু স্বর্গ আয়ত্ব হইলে এই দীনা চারুদত্তাকে ভুলিও না..."

তাহাকে তো শালীনতা শেখায় নাই কেহ, হঠাৎ সুজাতকের হস্তদ্বয় ধরিয়া মিনতিতে যেন ভাঙ্গিয়া গিয়া বলে—"করিবে না তো বঞ্চিত কুমার? না, দেবতাদের মত, চারুদত্তার মত তুমিও ভুল করিয়া বসিবে?"

তরুপাদমূলে শিলাখণ্ডের উপর ভদ্রার কলোচ্ছ্বাসের মত, হাস্য কৌতুকের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, শিলা অচল রহিল বটে কিন্তু তাহার অন্তঃস্থল পর্যন্ত কি আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে?

(৪)

সে-সন্ধান রাখিবার জন্য সুজাতকের কোনও প্রয়োজনও ছিল না, ব্যস্ততাও ছিল না। চারুদত্তার স্বৈরগতি, তাহার লঘুতা আশ্রম-জীবনের এমন একটা সাধারণ ব্যাপার, আর সুজাতকের নিকট আসিয়া তাহার সহিত রহস্য ক্রমে এমন দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সেটাতে মনোযোগ আকর্ষণের কিছুই নাই। এক এক সময় হয়তো এক প্রকার অনামনস্কতা আসে; কিন্তু সে ক্ষণিক, অস্পষ্ট।

একদিন কিন্তু কোথা হইতে কি হইল, সুজাতক হঠাৎ নিজের মনের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল...

চারুদত্তা কয়েকদিন আসে নাই, কি এক অভিনব খেয়াল লইয়া সে ব্যস্ত আছে বোধ হয়। বাধাহীন অবসর পাইয়া সুজাতক শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া সে যেন আরোহিকা দিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে উঠিয়া চলিয়াছে।

ক্রমবর্ধমান বৈরাগ্যের একটি সুনিবিড় আনন্দে মনটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আর তাহার ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলায় পৃথিবী যেন ক্রমেই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিতেছে।

এমনি এক সময় কেমন অহেতুক ভাবেই মনে পড়িয়া গেল—এই সময়টিতে চারুদত্তা আসিবার কথা,—সে আজ কতদিন হইল আসে নাই।

একবার আনমনা ভাবে চক্ষু তুলিয়া আবার তখনই হস্তধৃত পৃষ্ঠাটি উলটাইয়া সুজাতক গ্রন্থে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু কোথা দিয়া কি একটা বিপর্যয় যে ঘটিয়া গেল, এই একটু পূর্বের প্রাণপূর্ণ ওজস্বী অক্ষরগুলা যেন কংকালের মত শুষ্ক হইয়া গেল, এবং যে দৃপ্ত বৈরাগ্য এতক্ষণ একটি সমাহিত তৃপ্তির আকারে মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল সেই বৈরাগ্যই যেন রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকের আকাশ বাতাসে এক আকুল হাহাকার তুলিয়া তাহার চেতনাকে মুহ্যমান করিয়া দিল...কখন্ তাহার গ্রন্থলগ্ন অঙ্গুলি নিশ্চল হইয়া গেল এবং গ্রন্থচ্যুত দৃষ্টি দূরে কাছে সকল স্থানেই কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। মনে হইল যেন সে-ই পৃথিবীর যা কিছু, সে-ই তাহার অজস্র মুক্ত আনন্দ দিয়া এই আশ্রম, দিগ্বলয়িত এই গিরিকানন, এই নদী—দূরের কাছের যাহা কিছু সমস্তই সত্য করিয়া রাখিয়াছিল; আজ সে কতদিন নাই, তাই সমস্ত যেন প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় উদাস, মলিন হইয়া গিয়াছে।

চিত্তের গহন কন্দরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরও কত সব অচিন্তিত কথা, কত অচিন্তনীয় প্রশ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একি—ব্যথা, না আনন্দ?

সুজাতক আর মনের দিকে চাহিতে সাহস করিল না। এই দ্রবমান মনকে কঠিনতর নিরোধের দ্বারা একেবারে বিশুষ্ক করিয়া লইবার জন্য সে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিল।

আশ্রমের এই মুক্ত বহিরাঙ্গণ নিরাপদ নয়। এখানে তরুলতার মর্মরে, বিহঙ্গের কাকলিতে, ভদ্রার কল্লোলে একটা অতি সূক্ষ্ম মাদকতা আছে—বিষবায়ুর মত শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অলক্ষিত ভাবেই তাহা চিত্তের বিকার জন্মায়; এরই মায়ার মধ্যে চারুদত্তা তাহার উপস্থিতির দ্বারা বিস্মরণ ঘটায় আর অনুপস্থিতির দ্বারা ঘটায় বিভ্রম। এখানে অনাবৃত আকাশের

তলে তপঃবিঘ্নের সমস্ত পথই খোলা। সুজাতক বৃক্ষবেদী ত্যাগ করিয়া একদিন কুটীরে প্রবেশ করিল এবং তপভ্রংশের সমস্ত সম্ভাবনাকে বাহিরে ফেলিয়া কুটীর দ্বার বন্ধ করিল। কঠোরতর তপস্যা আরম্ভ হইল।

পরিণাম কিন্তু হইল বিপরীত; সুজাতক অচিরেই বুঝিতে পারিল তাহার অতি-নিরুদ্ধ চিত্ত স্পষ্ট ভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে—তাহার নগ্ন প্রকৃতিতে—তাহার আশা-আকাঙ্খার সমস্ত দাবী লইয়া—তাহার সমস্ত ব্যর্থতার সুতীব্র অনুযোগ লইয়া। কেন তাহার এ নির্যাতন? যুগ যুগ ধরিয়া আকাশ আর ধরণীর যুগ্ম তটের মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের অপ্রতিহত স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—সে কবি, সে মরমী, বিধাতার বরে সে চক্ষুষ্মান, সে-ই এই অমৃতধারার অধিকারী। যাহারা অন্ধ, এর অস্তিত্বই যাহারা জানে না; তাহাদের কাছে এর গৌরব কোথায়? সে বৃত হইয়াও, অধিকারী হইয়াও আত্মপ্রতারণা করিল? বিধাতার দেওয়া অঞ্জনপ্রলেপ স্বীয় করে মুছিয়া ফেলিল?...সুজাতকের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া যায়; তাহার প্রায়ান্ধকার তপঃকুটীরে—মরুর বুকে মরীচিকার মত একটা মায়ার লীলাস্রোত উচ্ছ্বল হইয়া ওঠে—নিঃসংকোচ নীলাকাশ, গীতগন্ধে ভরা বিচিত্র জীবন..উষার অস্পষ্ট আলোকে শতদলের মত ভাসিয়া ওঠে কত দিনের কত হাসি, স্তিমিত সন্ধ্যার নক্ষত্রের মত কত অর্ধবিস্মৃত অশ্রু-জল। .দিকচক্রবালে নবোদিত চন্দ্রের মত জাগিয়া ওঠে চারুদত্তা কোন্ যাদুবলে—যাহার মধ্যে আকাশ-বাতাস, হাসি-অশ্রু সব কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। ..এই তো জীবন অবাধ, স্বতঃসিদ্ধ, সুস্পষ্ট। এই মহাসত্যকে ঠেলিয়া সে বিরস, গৈরিক, কালজীর্ণ তালপত্রের গভীর বলিরেখার মধ্যে কিসের সন্ধানে আকুল?

তালপত্রের মসীরেখা আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে, যেন ক্রুদ্ধ ভ্রূভঙ্গি: পরুষ উচ্চারণে শাস্ত্রগ্রন্থ বলে—"মূঢ়, অক্ষরের অন্তরালে অর্থের মতই এই বিশ্বের পরমার্থ বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে সুগুপ্ত; তুমি অর্থ ছাড়িয়া অক্ষরের রেখাবিন্যাসেই রুদ্ধ দৃষ্টি হইয়া থাকিবে? এই মোহ কি তোমার জন্য?"

সংশয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণে মন গতিহীন হইয়া পড়ে, একটা কঠোর আত্মবিপ্লবের শ্রান্তি ভিন্ন এক এক সময় আর কিছু অনুভব করিবার শক্তি থাকে না।

(৫)

শ্রাবণ রজনী। সুজাতক শাস্ত্র-নিবিষ্টচিত্ত হইয়া কুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়াছিল, হঠাৎ মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দ তাহার কানে বাজিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বায়ুতাড়িত হইয়া সমস্ত আশ্রমভূমি যেন সুপ্তির কোল হইতে এক নিমিষে জাগিয়া উঠিল। বায়ুর বেগে তাহার তৃণকুটীর উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

সুজাতকের দেহে যেন একটা আনন্দ শিহরণ জাগিল এবং কেমন করিয়া বলা যায় না, প্রকৃতির এই বিপ্লবের মধ্যে চারুদত্তার মুখখানা হঠাৎ ভাসিয়া উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবে কম্পিত দীপশিখাটি সতেজ করিতে করিতে সুজাতকের মনে পড়িয়া গেল আশ্রম-পশুগুলির কথা . আহা, চারুদত্তার পালিত জীব সব, এখনই এই নিদারুণ ঝঞ্ঝাবৃষ্টিতে তাহাদের কষ্টের আর পরিসীমা থাকিবে না।

সুজাতক বাহির হইবার জন্য দ্বার খুলিতেই ঝটিকার সঙ্গে একটি একটু বড় গোছের পতঙ্গ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া সুজাতকের হাসি পাইল, -নিরাপত্তার ধারণা মন্দ নহে, জলবায়ু হইতে একেবারে অগ্নিতে আশ্রয়! সে ক্ষিপ্র-গতিতে গিয়া পতঙ্গটিকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আবার দ্বার খুলিতেই পতঙ্গটি সবেগে প্রবেশ করিয়া দীপাভিমুখী হইল। সুজাতক পুনরায় তাহাকে বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,--আহা, অবোধ জীব!

এবার পতঙ্গটি দ্বারমুক্তির অপেক্ষা করিল না; নিজের শরীরটিকে সাধ্যমত সংকুচিত করিয়া, দ্বারের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে প্রাণপণ শক্তি দিয়া প্রবেশ করিল এবং সুজাতকের চেষ্টাকে কিছুক্ষণ ব্যর্থ করিয়া চক্রাকারে প্রদীপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

সুজাতক একটু বেগ পাইয়াই সেটিকে ধরিল, তাহার পর একটি মৃৎপাত্রে চাপা দিয়া আশ্রম-পশুগুলির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। বৃষ্টি তখন সমাসন্ন।

ক্ষণপরে বৃষ্টিতে আপাদমস্তক সিক্ত হইয়া ফিরিল। দ্বার ঠেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।—ধ্যানাকৃষ্টার মতই চারুদত্তা তাহার গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান, তাহার পায়ের কাছে দগ্ধপক্ষ সেই বহ্নিকামী পতঙ্গটি, দূরে মৃৎপাত্রটি বসান রহিয়াছে।

বিস্ময় অপগত হইয়া সুজাতকের চক্ষু করুণায় সজল হইয়া আসিল। চারুদত্তার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"চারুদত্তে, এই মূঢ় পতঙ্গ দীপশিখায় বারম্বার আত্মঘাতী হইতে যাইতেছিল, তাই আমি ইহাকে মৃৎপাত্র চাপা দিয়া রক্ষা করি ."

চারুদত্তা নিঃসংকোচ হাস্যে ক্ষুদ্র কুটীরখানি কম্পিত করিয়া বলিল-- "কুমার, ঝঞ্ঝার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভবনা দেখিয়া আমি আশ্রম-পশুগুলিকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য যাইতেছিলাম, এমন সময় তুমুল বর্ষা নামিল। ক্ষিপ্রগতিতে তোমার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখি কুটীর শূন্য। মনে হইল তাহা হইলে একটু শাস্ত্র আলোচনাই করা যাক। ভদ্রার জলে নামিলে যেমন জলমত্ততার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া ওঠে, তোমার এই তপোগৃহে প্রবেশ করিলেও তেমনি ভাবে জ্ঞানলিপ্সা প্রবল হইয়া ওঠার সম্ভাবনা আছে দেখা গেল। কিন্তু শুভকর্মে তো বাধা থাকে, একটা চাপা শুষ্ক শব্দ কানে গেল। 'সর্প নয় তো?'- বলিয়া মাথা ঘুরাইতেই উবুর করা ঐ পাত্রটার উপর দৃষ্টি গেল, শব্দ ওরই মধ্য হইতে আসিতেছে।

"কৌতূহলী হইয়া পাত্রটি তুলিয়া ধরিতেই ঐ পতঙ্গটি সবেগে বাহির হইয়া আসিল, বুঝিলাম, এ কুমারের অহিংসাব্রতের নিদর্শন। আমার বড় হাসি পাইল।"

সুজাতক কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং অনেকটা অনুযোগের স্বরে বলিল- "তোমার হাসি পাইল? আমি ওকে দাহন হইতে রক্ষা করিলাম, সুধীগণের মতে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম "

চারুদত্তা আবার সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল; বলিল—"এ ধর্ম মন্দ নহে। কুমার, তাহাকে আলোক থেকে, তাহার মুক্তি থেকে, তাহার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকার কারাগারে তাহার শ্বাসটুকু রোধ করিবার উপক্রম করিয়া এ ধর্ম মন্দ নহে। আমায় নিজেকেই এবার সাবধান হইতে হইবে, কোন দিন তঙ্গচূড়ের বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া কুটীরের এই নিরাপদ গণ্ডীর

মধ্যে আমায় না কারারুদ্ধ কর..."

বাহিরে মেঘগর্জন চলিয়াছে,—মৃদঙ্গের সহিত সংগীতের মত তাহার কণ্ঠে আবার কলহাস্য জাগিয়া উঠিল। পায়ের কাছে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গটি পড়িয়া আছে, নিশ্চল।

চারুদত্তা বলিতে লাগিল—"বাঁচিয়া মরার চেয়ে মরিয়া বাঁচা কি বাঞ্ছনীয় নয়, কুমার? মুক্ত হইয়া উহার যদি উল্লাস দেখিতে! পতঙ্গ হইয়া উহার যখন জন্ম, তখন প্রদীপে দাহন তো ওর সুনিশ্চিত, কুমার। তোমার উচিৎ ছিল উহাকে বহু দূরে লইয়া গিয়া নিরাপদ করা অথবা দীপ নির্বাণ করিয়া দেওয়া।"

হাসিয়া বলিল—"নির্বিঘ্ন অন্ধকার সেও কিছু মন্দ নয়, কিন্তু আলোর তো কোনও অপরাধ নাই, তাহাকে অযথা নিভান অন্যায়; অন্যায় নহে কুমার?"

সুজাতক অন্যমনস্ক ছিল, প্রশ্নে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"হ্যাঁ, অন্যায় বৈকি।"

"আলোর যখন দোষ নাই তখন পতঙ্গকে সরানই ছিল সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত, কেননা আলোয় ঝাঁপ দিতে গিয়া পতঙ্গ নিরপরাধ প্রদীপকে নির্বাপিত করিয়াছে—এমনও দেখিয়াছি কুমার।"

চারুদত্তার তনু অবয়বে, স্ফুরিত অধরে এবং কৌতুকচপল আয়ত চক্ষু দুইটিতে কম্পমান দীপশিখার চঞ্চল আলোক দুলিতেছে। সুজাতক বতী সুজাতক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। আজই, এই একটু পূর্বে, দুর্যোগের প্রারম্ভে চারুদত্তার মুখখানি মনে পড়িয়াছিল—অমনভাবে মনে পড়া পূর্বে কখনও ঘটে নাই। তাপদগ্ধ নিদাঘের শেষে এই ঝঞ্ঝার মত সে মনে পড়াও একটা দুর্যোগ—তাহার বৈরাগ্যের যত্নসঞ্চিত কঠোরতার উপর একটা অব্যর্থ আক্রমণ!...সেই চারুদত্তা এখন এই গৃহমধ্যে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া। সুজাতক ফিরিয়া দেখিল না বটে, তবে দেখিল না বলিয়াই স্পষ্টতরভাবে অনুভব করিল—তাহারই অঙ্গের উপচীয়মান দীপ্তিতে প্রদীপের অকিঞ্চন আলোক ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছে। জলন্ত কিরণরেখার মত তাহার আরক্ত পদনখের কাছে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ পড়িয়া।

*　　*　　*

কত রাত্রে বলা যায় না, একবার বায়ু মন্দীভূত হইল; মনে হইল বর্ষাও ক্ষান্ত হইয়াছে। চিন্তার স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া সুজাতক কুটীরের দ্বার খুলিয়া বলিল—"চারুদত্তে, এই অবসরে তুমি প্রস্থান কর, আবার বোধ হয় এখনই বর্ষা নামিবে।" চারুদত্তা বাহির হইলে একবার মনে হইল আগাইয়া দিয়া আসে, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া গেল না। ফিরিয়া আসিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল।

রাত্রির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগ আরও বাড়িল। প্রকৃতি ক্ষণিকের জন্য বিরাম লইয়া আবার যেন প্রলয়ের উন্মাদনায় জাগিয়া উঠিল। সুজাতক অনুভব করিল আজ তাহার মনেও এইরূপ—বোধ হয় এর চেয়েও একটা প্রবলতর ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ ছারখার করিয়া দিতেছে।...কোথায় জ্ঞান? কোথায় বৈরাগ্য? কোথায় ধর্ম?—থাক সব।—কী ধর্ম তাহার? তাহার অন্তরের অন্তর প্রশ্ন করিয়া উঠিল—জীবনের মূল প্রকৃতির সহিত বিরোধ করিয়া এই যে কঠোর সাধনা, এই কি প্রকৃতই তাহার ধর্ম?—এই কি জীবনসত্যের উপলব্ধি? সে কবি, সৃষ্টির বিচিত্র রূপের রস লইয়া তাহার চিত্তশতদল ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে ভুলিয়া মরুর দহনে বিদগ্ধ করাই কি তাহার ধর্ম?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—যদি ইহাই তাহার ধর্ম হয়, এই দীর্ঘ বৎসরত্রয়ের তপস্যাতেও সে কি এই ধর্মে কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর হইল—না, পারে নাই। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ না হইয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বৎসরত্রয়ব্যাপী এই দীর্ঘ সময়ের উপর দিয়া একবার অতীতের পানে ফিরিয়া গেল। দেখিল কিছুই ব্যর্থ হয় নাই। এখানকার গিরি-বন, নদী-কান্তার, দিগ্‌লুণ্ঠিত উদার আকাশ—এখানকার যা কিছু সমস্তই তাহার জীবনে সত্য হইয়া আছে। সে যখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, ইহারা সব কোন মায়ার বলে তাহার চিত্তের গহনলোকে প্রবেশ করিয়া বসিয়াছিল। কি করিয়া এ সম্ভব হইল? মনের এই মণিকোটার কুঞ্চিকা কাহার হাতে ছিল?

তাহার সমস্ত মনকে দীপ্ত করিয়া চারুদত্তার মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল,—যেন তাহার প্রশ্নের নীরব উত্তরের মতই। শত প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও সেই তাহার মনকে পূর্ণ করিয়াছিল। কোন্ অবোধ্য নিয়মে মনের পথে তাহার

গতি ছিল অবাধ এবং সে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য ছানিয়া লইয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিত—ভ্রমর যেমন পুষ্পের পরাগ মাখিয়া, পুষ্পের মধু লইয়া, পুষ্পের গন্ধ বহিয়া বিবরে প্রবেশ করে।

আজ ঝঞ্ঝার রাত, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অসংযম। সুজাতক চারুদত্তাকে অস্বীকার করিল না, কোন-কিছুর ভয়ে, কিংবা জীবনাতীত কোন-কিছুর আশায় তাহাকে প্রত্যাখান করিল না। তাহার অন্তর এক মধুর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নিজেকেও অস্বীকার করিল না।—সে কবি; রূপ তাহার সাধনা, আবার হয়তো রূপই তাহার মৃত্যু। যদি তাহাই তাহার জীবনের সত্য তো তাহাই হোক। তাহার মনে পড়িল—"বাঁচিয়া মরার চেয়ে মরিয়া বাঁচা কি বাঞ্ছনীয় নয় কুমার?" ... . "হ্যাঁ, হে প্রিয়ে, হে দীপ, হে বহ্নি, মরিয়া বাঁচাই তো বাঞ্ছনীয়। এই তিনবৎসরের দীর্ঘ যুগ ব্যাপিয়া চৈতন্যহীন আবেগে আমি তোমাকেই আবেষ্টন করিয়া ঘুরিয়াছি, এইবার বক্ষ পাতিয়া তোমায় গ্রহণ করিব। একটি সমস্ত-বিলীন করা আলিঙ্গনে থাকিবে তুমি আর আমার মৃত্যু,—সুতীব্র সুখ, আর সুকঠোর বেদনা ... কি আনন্দ—কী আনন্দ! ..."

চিন্তার এই আনন্দ হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। কানে বাজিয়া উঠিল চারুদত্তার কথাগুলো—"আলোয় ঝাঁপ দিতে গিয়া পতঙ্গ নিরপরাধ প্রদীপকে নির্বাপিত করিয়াছে এমনও দেখিয়াছি কুমার।" তাহাই কি হইবে? সার্থক মরণ মরিতে গিয়া সে কি এই অম্লান দীপশিখা নিভাইয়া দিবে?

বাহিরের ও অন্তরের ঝঞ্ঝা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কয়েকদণ্ডের রজনী যেন দীর্ঘায়িত হইয়া একটি যুগে পর্যবসিত হইয়াছে। ঝঞ্ঝারও অন্ত নাই, চিত্তের দ্বন্দ্বেরও অবসান নাই। আশা-বাসনা-বিদ্রোহ-বিষাদের আলোড়নের মধ্যে সমস্ত চিত্তাকাশ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুজ্জ্বালার মত শুধু একটি কথাই ঝলসিত হইয়া উঠিতে লাগিল—"যদি নিরপরাধ প্রদীপ নির্বাপিত হয়! . . নিরপরাধ প্রদীপ—গ্লানিহীনা অকুণ্ঠা এই বালিকা ..."

এক সময় একই সুরে বাঁধা বাহির ও অন্তর-প্রকৃতি শান্ত হইয়া আসিল; সমস্ত গর্জনমন্থন থামিয়া গিয়া একটা অতল শ্রান্তিতে, একটা নিঃশব্দ বিষাদে বিশ্বচরাচর ভরিয়া গেল। সুজাতক চিত্তস্থির করিয়া লইয়াছে।

* * *

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আশ্রমবাসীরা দেখিল সুজাতকের কুটীর শূন্য। প্রদীপমূলে মুদিত শাস্ত্রগ্রন্থের উপর দগ্ধপক্ষ একটি মৃত পতঙ্গ: পাশে সুজাতকের হস্তাক্ষরে লেখা—"আমার প্রশ্ন।" সকলে বিস্ময় মানিল।

সকলে বিস্ময় মানিল

সুজাতক শাস্ত্রের চিরসন্দিগ্ধ ললাটতটে জগতের চির অমীমাংসিত প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

স্বয়ম্বরা

আপনারা ব্যাপারটা সম্বন্ধে খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিতে পারেন, আমার প্রত্যক্ষ দেখা।

আর খবর কাগজে কতটুকুই বা দিয়া থাকিবে? হদ্দ চার পাঁচ লাইনের একটা সংবাদকণিকা,—অমুক জায়গায়, অমুক সময়, অমুক এক ঘটনা ঘটিয়াছিল—বহু লোকের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে—ইত্যাদি ইত্যাদি। পলিটিক্স লইয়াই ওদের দম ফেলিবার ফুরসৎ নাই, এসব কথা একটু যে শাখাপল্লবে বিস্তারিত করিয়া দিবে, সে অবকাশ কোথায়?

অথচ ব্যাপারটা কি সত্যই এত সামান্য? স্বয়ম্বরা-প্রথাটা যে এখনও কোথাও বিদ্যমান আছে, প্রত্যক্ষ না করিলে আমিই কি বিশ্বাস করিতাম? আমাদের মধ্যে স্বয়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে শৌর্য গেছে, বীর্য গেছে, যৌবন হইয়া পড়িয়াছে স্থবির। জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটুকু হইতে আমরা রোমান্স, অ্যাড্‌ভেঞ্চার সব ছাঁটিয়া দিয়া সেটাকে নেহাৎ দায়ে-পড়া রুটিনগত 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে' একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস দাঁড় করাইয়া লইয়াছি।

যাক, আসল কথাটাই আরম্ভ করি, দুঃখের চোটে গোটাকতক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল।

আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ন স্থানং তিলধারয়েৎ—মোটরে, ঘোড়ার গাড়িতে, রিক্‌শতে, সাইকেলে যেন চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে, পায়ে হাঁটিয়া যাহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার তো কথাই নাই। পার্কের দুই ধারের রেলিং ঘিরিয়া লোকের ভিড়, ওদিকে চারিদিকে ছাতে পর্যন্ত লোক জমিয়াছে। একে কলিকাতা শহরটাই হুজুগের জায়গা, তাহার উপর স্বয়ম্বরা প্রাঙ্গণটাও বাছা হইয়াছে শহরের বুকের উপর একেবারে। যতই সময় যাইতেছে, কথাটা ততই রাষ্ট্র হইতেছে, ততই কাতারে কাতারে দর্শকবৃন্দ আসিয়া জড় হইতেছে। সামনের দিকের ভিড়ের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এক একটা তুমুল কলরব উঠিতেছে। নানা রকমের মন্তব্যও শোনা যাইতেছে—"থামিয়ে দাও সবাই মিলে, খুন হবে একটা!!"—"কার

সাধ্য ওদের এখন থামায় মশাই? ওদের রক্ত এখন গরম হয়ে গেছে!”—“পুলিস কি করছে? নেবে পড়ুক না। কতক্ষণ চলবে এরকম?” এ সমস্তের ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া থাকিয়া একটা বীভৎস রণ-হুংকারের মত উঠিতেছে। সমস্ত প্রাঙ্গণটা ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। কৌতূহল ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। কোন রকমে মোটরের পাশ দিয়া রিক্শর ভিতর দিয়া, তেরছা হইয়া মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়া গলিয়া সামনে উপস্থিত হইলাম। সে এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার!

তখন প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় রণপ্রাঙ্গণের দুই প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক উৎকট দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে ভৈরব রণনিনাদ ছাড়িতেছে। গামাকিক্কড়ের তালঠোকা দেখিয়াছি, মুষ্টিযোদ্ধাদেরও পাঁয়তারা দেখিয়াছি, কিন্তু এরকম ভয়ংকর কিছু ব্যাপার কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আর কি ভীষণ লাস! যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনই প্রস্থে! আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে পাশের একটি ভদ্রলোক বলিল, “দেখছেন কি মশাই, এসব এখানকার নয়; বাংলার মাটিতে এ শরীর হয় না। এ একেবারে সেই পশ্চিমের, দিল্লী-আগ্রারও ওদিককার।”

আমি বলিলাম, “তা হোক, কিন্তু মাঝ শহরে একি ব্যাপার মশাই!”

ভদ্রলোক বলিল, “যেখানেই পশ্চিমাদের বাড়, সেইখানেই এই সব উপদ্রব আজকাল। কর্পোরেশনেরও নজর নেই এদিকে, আর পুলিসের অবস্থা তো দেখছেনই। বড়বাজারের দিকে তো প্রায়ই এরকম হচ্ছে। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, কিছু একটা নিয়ে থাকা চাই তো। আপনার আমার মত তো আর চাকরি খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে না।...কিন্তু বলিহারি গতর! এক একটা জাং দেখুন, আমাদের সমস্ত শরীরে অতটা মাংস নেই।”

পাশে একটি বিরাটকায় শিখ ড্রাইভার দাঁড়াইয়া ছিল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, বড়রা ছোটর দিকে চাহিয়া যেমন একটা করুণা-মিশ্রিত প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। বুকের উপর হাত দুইটা জড় করিয়া শরীরে অল্প একটু চাড়া দিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল। রুক্ষ ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিল, “ওরা তো দুব্লা হয়ে গেল বাবুজি হিঁয়াকা পানিসে। উস্‌কা আপানা মুলুকমে দেখতা তব তো! বঁহাকা পানি বাংলাকা দুধ। চিলিয়ানওয়ালা জানতা হ্যায় বাবুজি?”

প্রশ্ন করিলাম, "কোন্ চিলিয়ানওয়ালা? যাঁহা অংরেজকা সাথ শিখকা লড়াই হুয়া থা?"

ডান হাত দিয়া বাম বাহুতে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে করিতে শিখ বলিল, "হাঁ, অংরেজকো হারায়া শিখ। আমার দাদা লড়িয়েছিল। বাঁয়া হাত বিলকুল উড়িয়ে গিয়েছিল বাবুজি। আওর হাম পেটকা ওয়াস্তে মোটর হাঁকতা হ্যায়—হাঃ হাঃ হাঃ। সার্জেণ্ট উংলি উঠাতা হ্যায়, মোটর খাড়া কর্ দেনে পড়তা হ্যায়!"

দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিল। বুঝিলাম, বিরাট প্রাঙ্গণে এই দ্বৈরথের দৃশ্যে ওর রক্তে দোল লাগিয়াছে, ওর নিজের ধমনীতে চিলিয়ান-ওয়ালার রণাঙ্গনে নিহত ওর ঠাকুরদাদার রক্তের জোয়ার নামিয়াছে।

আমি মুখ ফিরাইয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, একটা কলরব উঠিল এবং শিখ হঠাৎ "দেখো বাবু! দেখো! দেখো!" বলিয়া প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে রণাঙ্গনের পানে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

প্রাঙ্গণের দুই দিক হইতে ভীম পরাক্রমে ছুটিয়া আসিয়া তখন তাহারা দুইটি মাথা একত্র করিয়া নানা রকম ভাবে পরস্পরকে প্যাঁচে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা পালোয়ানদের মল্লযুদ্ধ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কায়দাটা বুঝিবেন। তফাৎ এই যে, সাধারণ মল্লযুদ্ধে বড় একটা মাথা ভাঙ্গে না এক্ষেত্রে ইহাদের উভয়েরই কপাল ফাটিয়া দ্রুতক্ষরমান রক্তবিন্দুতে নিচের ভূমিটা প্রায় সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের নিজের দল পূর্ব হইতেই ছিল নিশ্চয়, দর্শকদের মধ্যেও লড়াইয়ের ছোঁয়াচ লাগিয়া নিজের নিজের হিরো বাছিয়া লইয়াছে।

সাধারণত, দর্শকদের মধ্যে যে যে-দিকে দাঁড়াইয়া, সে সেই দিকেরটির পক্ষ লইয়াই চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটা ক্রমে এপাড়া ওপাড়ায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নানাবিধ উত্তেজক যুদ্ধবাণী, অর্থহীন বিকট চীৎকার এবং অর্থ-পূর্ণ অশ্রাব্য গালাগালে বাতাসটা ভরিয়া উঠিতেছে - যতদূর বুঝিলাম, শেষেরগুলা প্রধানত পাড়া লক্ষ্য করিয়া।

ইতিমধ্যে লড়াই অমোঘ বিক্রমে চলিয়াছে। উগ্র আস্ফালন! লড়িতে লড়িতে কখনও কখনও উভয়ে প্রাঙ্গণের এ প্রান্তে আসিয়া পড়িতেছে, কখনও কখনও ও প্রান্তে ঠেলিয়া উঠিতেছে। সামনের লোকেরা পিছন দিকে চাপ

দিয়া সেইখানে অঙ্গনটা বিস্তারিত করিয়া দিতেছে, খানিকটা আছড়া-আছড়ি, আবার অন্য এক কেন্দ্রে গিয়া উঠিতেছে। শরীরের পেশীগুলো লোহার গোলকের মত হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, জমিতে গা ঘষিয়া গিয়া রাঙা-রাঙা দাগ ফুটিয়া উঠিতেছে, রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, আক্রোশও বাড়িতেছে; জনতাও ক্রমেই রক্তের নেশায় যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ওদিকে ভিড় চাপের উপর চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে, একবার ডিঙি মারিয়া ঘাড়টা উঁচু করিয়া দেখিলাম, মোটর, রিক্‌শ, ঘোড়ার গাড়ির লাইনটা পিছনে প্রায় দুইগুণ হইয়া গেছে। আরও আসিতেছে, আটকাইয়া পড়িতেছে, যে মুখের পানেই চাও একটা অদম্য কৌতূহল, একটা উৎসুক প্রশ্ন যেন মাখানো। অনেকে আগ্রহ চাপিতে না পারিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া সামনে আসিবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে। খবরের কাগজে আপনারা এত সবের কিছুই পান নাই। পুলিস পর্যন্ত, শান্তিরক্ষা যাহাদের কর্ম, লড়াইয়ের মাতনে মাতিয়া উঠিতেছে। পাশের ভদ্রলোকটি বলিল, "Here is a sample of your Swaraj! পুলিস বেটার ডিউটি-জ্ঞান দেখছেন তো? তন্ময় হয়ে গেছে একেবারে।"

সত্যই দেখি, পুলিসটা, ক্রিকেটের বল ধরিবার উদ্যোগে খেলোয়াড়রা যেমন পা দুইটা সরাইয়া ব্যাঙের মত বাঁকিয়া দাঁড়ায়, সেইভাবে ঝুঁকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাঁও-প্যাঁচগুলোর হিসাব লইতেছে। একবার বাঁয়ে হেলিতেছে, একবার ডাইনে, তালি দিতেছে, হাত কচলাইতেছে।

শিখ প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "উ জরুর খুদ্‌ভি লড়ে বাবুজি চেহ্‌রা দেখছেন না? লড়াই সমঝে উ।"

একটু বিরতি। দুই পক্ষ হঠাৎ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িল। মরণ-আলিঙ্গনে নিবদ্ধ হইয়া তাহারা উভয়েই মরণের কতটা কাছে যে গিয়া পড়িয়াছে, এতক্ষণে আরও ভাল করিয়া টের পাওয়া গেল। দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গা হইতে ধারাপ্রবাহে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে,—চাওয়া যায় না যেন। ওদের নেশা কিন্তু এখনও কাটে নাই—চোখে স্ফুলিঙ্গ, বুকে আক্রোশ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে!

শিখ ড্রাইভার উত্তেজিত করিবার জন্য মুখের উপর দুই হাতের আঙুলগুলো জড় করিতেই আমি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "পাইজি,

আর ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার, মারা পড়বে যে, যে রকম অবস্থা দেখছি, দুটো গোঁয়ারই মারা পড়বে। বাপ! কি ব্লীডিং! কাছাকাছি কোন হাসপাতাল—"

শিখ একটা উৎকট হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসি আমরা হাসিতে পারি না। চিলিয়ানওয়ালার মরণ-যজ্ঞের সঙ্গে যাহাদের বংশের কাহিনী গ্রথিত, তাহারাই পারে। শিখ নিরস্ত হইল না; মুষ্টির সাহায্যে তীব্র এক ধরণের রণসংকেত দিয়া বলিল, "ওরা সব বাংলা মুলুককা নেহি আছে বাবুজি, ছটাক ভরকা খুন গিরনেসে হাসপাতালভি যানে নেহি পড়েগা, মরেগা ভি নেই। আর ছাড়িয়ে দিয়ে কি করবে বাবুজি? যবতক একটা দোসরাকে বিলকুল ঘায়েল না করবে, তবতক তো ঠাণ্ডা হোবে না; এখানে ছাড়াইয়া দাও, দুসরা জায়গা গিয়ে লড়বে। হামলোককা মুলুকমে অ্যাসা তো অক্‌সর হোতা হ্যায়। এর বীচমে যে মাইয়ালোক রয়েছে বাবুজি!" বলিয়া পাইজি ঠোঁটের একটা দিক কুঞ্চিত করিয়া, একটা চোখ অর্ধ মুদ্রিত করিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল।

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "মেয়েলোক আছে এর মধ্যে? সেকি! এই শহরের মাঝখানে---পুলিস-কন্‌স্টেব্‌ল—"

পাইজি হঠাৎ আমার মুখের উপর একটা হাত দিয়া আর একটা হাত প্রাঙ্গণের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "আরে দেখো বাঙালীবাবু, বড়া বকতা হ্যায় তুম সব---খালি পুলিস, হাসপাতাল জানতা হ্যায়।. লাগ্, লাগ্, লাগ্‌যা ভেইয়া! চ্যু!!..."

আবার সেই আঙুলে-গড়া পাঞ্চজন্যের বিকট শব্দ।

ওদিকে এবার একটা অন্যটাকে বেশ চৌকস করিয়া ধরাশায়ী করিয়াছে। আর আঘাত! সে যে কি নিষ্ঠুর অব্যর্থ প্রহার, বলিয়া শেষ করা যায় না। নিচেরটার আক্রোশের হুংকার ক্রমেই কাতর গোঙানিতে আসিয়া পাড়িতেছে, উপর হইতে ক্ষমাহীন অবিরাম আঘাতের বর্ষণ! পাইজি বিজয়ীর সঙ্গে প্রবল সহানুভূতিতে কি এক রকম অর্ধবক্র হইয়া লে লে লালা মেরা! লে লে ভেইয়া মেরা!' বলিয়া নানা প্রকারের উৎসাহধ্বনি উদ্গার করিতেছিল, আমি উদ্গত কৌতূহল আর চাপিতে না পারিয়া বলিলাম, "মেয়েলোকের কথা কি বলছ পাইজি? কোন মেয়েলোকেরা কি বাজি রেখে মাঝ-শহরে এই এত বড় চৌমাথা রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াই করাচ্ছে?"

পাইজি আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সে মাইয়ালোক নয় বাবুজি, ওদের আপনকার মাইয়ালোক, সে আশে-পাশে কোথাও তামাসা দেখছে;—বস্, লে লিয়া বাবুজি! দেখো, মার দিয়া বাজি লাল হামারা!" পাঞ্চজন্য আবার বিজয়-নিনাদ করিয়া উঠিল।

'দেখো, মার দিয়া বাজি লাল হামারা!'

নিচেকার ষাঁড়টা মরণ-বাঁচন চেষ্টা করিয়া একবার চাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ছুট, ছুট আর ছুট। লেজ তুলিয়া নাকের সোজা দৌড় একেবারে। পিছনে বিজয়মত্ত প্রতিদ্বন্দ্বী—তাহার একটা শৃঙ্গ মোচড়াইয়া হেলিয়া গিয়াছে, উরুর ত্রিশূলছাপের দাগ বাহিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

লোকেরা মরি-বাঁচি করিয়া পড়িয়া থেঁতলাইয়া বিদ্যুৎবেগে জায়গা করিয়া দিল।

*   *   *

আশুতোষ আর হাজরা রোডের মোড়ে রণাঙ্গনের কেন্দ্রে আবার ট্র্যাফিক পুলিস দাঁড়াইল। আবদ্ধ জনস্রোত আবার প্রবহমান হইল।

*   *   *

ভিড় হইতে বাহির হইয়া দেখি, আবার লোক জমিয়াছে, এবার পাশের পার্কের রেলিঙের ধারে ধারে। হায় রে কলিকাতা, দুইটা হুজুগের মাঝখানে কি একটা মিনিটেরও বিরতি দিতে নাই?

ব্যাপারটা কি?

আমি গিয়া দাঁড়াইলাম কোনরকমে একটু জায়গা লইয়া। তাহার পর যাহা দেখিলাম, সেই কথাই গোড়ায় তুলিয়াছি। সেই বিজয়ী বৃষশার্দূল পার্কের মাঝখানে সদম্ভে দাঁড়াইয়া, পাশে একটি শুভ্রা নধরকান্তি যৌবন-ভারালসা গাভী। বৃষরাজ উগ্র চক্ষে এবং সহুংকারে এক একবার চারিদিকে চাহিতেছে—ক আয়াতি?—কো মরণং যাচতে বা?

ধেনুসুতা শান্ত তৃপ্ত, বোধ হয় গরবী দৃষ্টিতে চাহিয়া গভীর প্রেমভরে বিজয়ী দয়িতের অঙ্গ লেহন করিতেছে।

তাহার শৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া একগাছি কি ফুলের মালা, বরমালাই বলি।—আপনারা সন্দিগ্ধভাবে চোখ তুলিয়া খবরের কাগজে ঘটনার দিন তারিখটা মনে করিতেছেন বোধ হয়। বোধ হয় বলিবেন, গোপাষ্টমী ছিল সেদিন, কেহ মাল্যচন্দনে পূজা করিয়া থাকিবে গাভীটির। আমি তো আপনাদের কথা অবিশ্বাস করিতেছি না; যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি মাত্র।

ভালবাসা

[**"কশ্চিৎ প্রৌঢ়"-বরেষু,**

গত শ্রাবণ (১৩৪৬) 'শনিবারের চিঠি'-তে আপনার 'ভালবাসা'-শীর্ষক সরস রচনাটি পড়িলাম। আপনার শেষ কথাগুলি এই—"পুরুষ এবং স্ত্রী-জাতির ভালবাসা প্রকাশের ধারার বিভিন্নতা কি?—এই ধরণের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন আছে। আপনাদেরও নিশ্চয় বলবার অনেক কথা মনে হচ্ছে এবং বলবার ইচ্ছা করছেন, সুতরাং এইবার আপনারা বলুন, আমি চুপ করি।"

বলিবার অনেক কিছুই আছে—সবারই, কেন না, ও জিনিসটির হাত হইতে কেহ তো আর রেহাই পাইল না। আর 'বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা'—সারা জন্মে দাগ মেলায় না। তাহা হইলে যাহা জানি বলি, আপনি চুপ করিয়া শুনুন।]

পুরুষের ভালবাসা সম্বন্ধে আপনার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই রহিয়াছে, শ্রীমতীর বেতো পায়ে ওরিয়েণ্টাল বাম মালিশ করিতে করিতেই সেটা বেশ অনুভব করেন। বরং আরও একটু আগাইয়া ধরিলে বলা যাইতে পারে, বাড়িতে নববধূরূপে সালক্তকচরণে তাঁহার প্রথম প্রবেশ করার সময় হইতে আপনার শুভ তত্ত্বাবধানে সেই পা-ই বাতগ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ অবসরে ভালবাসাব সব অবস্থারই আপনার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহার পূর্বেরও যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকে আপনার, অর্থাৎ পূর্বরাগের, তো সে সম্বন্ধে আপনি নীরব, সুতরাং আমার কৌতূহলও অনধিকারী। ধরিয়া লওয়া যাক- আছে, তাহা হইলে পুরুষের ভালবাসার অভিব্যক্তির প্রায় সব রূপ-গুলিই আপনার প্রত্যক্ষ করা। সুতরাং আপনার প্রশ্নের অর্ধেক হিস্যে বাদ দিলাম। বাকি থাকে মেয়েদের ভালবাসার অভিব্যক্তি। পুরুষ বর্বর, তাহার সমস্তটাই স্পষ্ট, তাহাকে অনায়াসেই চেনা যায়; নারী ঠিক বিপরীত ইহার, তাহাকে চেনা কঠিন, ঠিক যেমন কঠিন—পাহাড়ে উঠার চেয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করা। তবুও তাঁদের ভালবাসা সম্বন্ধে যতটা জানি অথবা জানি বলিয়া বিশ্বাস, তাহার কিছু বলি।

মোহাড়াতেই বলিয়া রাখি, আমার সঞ্চয় সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে। তবে বিশ্বাস করুন, আমার নিজের অভিজ্ঞতা নয়। তাহা না হইলেও কিন্তু আমি নিজের নামেই চালাইব। প্রথমত, ফাঁকতালে নিজেকে নায়ক করিয়া চালাইবার মধ্যে একটা নিখরচার আনন্দ আছে, আর দ্বিতীয়ত, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমায় বড় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের গূঢ়তম গোপন কথাটি বলিয়াছিল, তাহাদের নাম জাহির করা অধর্ম হইবে। এখন, যদি মূল নামই গুপ্ত রাখিলাম তো, নিজেকে বাদ দিয়া রামা-শ্যামাকে নায়ক করিয়া বসাই কেন?

কিন্তু মুস্কিল, কোথা হইতে আরম্ভ করা যায়? –বেশ, একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি—কুন্তলার কথা থেকে।

কুন্তলার বয়স তখন বছর সাতেক ।

বয়সের কথা শুনিয়া আপনি বিস্ময়ে হাত-পা গুটাইয়া বসিলেন যে' সাত বছরের মেয়ে ভালবাসার কিছু জানে না? খুব জানে। অত কথা কেন, স্থির হইয়া একটু অঙ্ক কষিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, জানে। আমরা পুরুষেরা সংসারে প্রবেশ করি বাইশ-তেইশ বৎসরে, ভালবাসায় হাতেখড়ি হয় চৌদ্দ-পনরোয়; ওরা সংসারে প্রবেশ করে চৌদ্দ-পনরোয়, মানেন তো? তাহা হইলে ভালবাসিতে সুরু কবে করিবে, আঙুল গুনিয়া দেখুন না!

কুন্তলা যখন সাত বছরের, তখন থেকেই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে। অবশ্য শত্রুভাবে আচরণ করিলে ভালবাসার পাত্রকে আরও শীঘ্র পাওয়া যায়—রামায়ণের এ তত্ত্বটা কুন্তলার জানা ছিল কি না জানি না; মেয়ে জাত, অবচেতনার স্তরে জানাও সম্ভব। মোট কথা, আমার জীবন অসহ্য করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমি মেয়েটাকে বাঘের মত ভয় করিতাম। উদয়াস্ত তাহার কাজ ছিল আমার খুঁত ধরা এবং সেইগুলি যথাস্থানে পেশ করিয়া আমায় যথাসাধ্য বিপন্ন করা। ও বয়সে ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব হয় না; কেন না, যাহাদের হাতে ঐ সময় আমাদের জীবন, জীবনের মাপকাঠি সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে অনেক মতভেদ থাকে। তবুও যদি কুন্তীর ভয়ে কোনদিন অতিরিক্ত সাবধান থাকিয়া নিখুঁত থাকিয়া যাইতাম তো, কুন্তী

নিজেই খুঁত গঠন করিয়া লইত।—আমার বইয়ের পাতা ছিঁড়িত, জুতার ফিতা হারাইত, গোটা পেন্সিলটা না ভাঙ্গিলে অন্তত তাহার সীস ভাঙ্গিত, বৈঠকখানার তাস, কাকার এস্রাজের তার পাওয়া যাইত আমার জামার পকেটে। নির্দোষ বেচারি আমি জানিতাম, কিন্তু কিছু বলিবার উপায় ছিল না। মেয়েটার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, আমায় যে পরিমাণ জ্বালাইতে পারিত, বাবা কাকা ওঁদের সবাইকে ঠিক সেই পরিমাণেই ভুলাইয়া হাতে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল—মাথার পাকা চুল তুলিয়া, কানে শুড়শুড়ি দিয়া, ফাইফরমাশ খাটিয়া, আরও তাহার নিজস্ব নানা পদ্ধতিতে। পলিটিক্স মেয়েদের মজ্জাগত, শুধু মজ্জাগতই নয়, জন্ম-সিদ্ধ। একবার আমার বালিশের তলায় সেজমামার হারানো ছুরি পাওয়া গেলে আসল অপরাধিনীর নাম করিয়া যে লাঞ্ছনাটা ভোগ হইয়াছিল, কোন জন্মে ভুলিব না। এখনও সব যেন স্পষ্ট, বাবার কোলের কাছে অভিমানে অশ্রুমতী কুন্তী, তাহাকে যেন কোনমতেই ঠাণ্ডা করা যায় না; বাবার হাতে মামার ছুরিটা, চারিদিকে ঘিরিয়া ছেলে-বড়য় এক পাল, সদ্যলব্ধ চপেটাঘাতে আমার বাঁ রগটা তখনও ঝিনঝিন করিতেছে। বাবা বলিতেছেন, "লজ্জা করে না তোমার রাস্কেল, নিজে দোষ করে পরের একটা নিরীহ মেয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাচ্ছ' কাওয়ার্ড! বেচারি তোমাদের বাড়ি আসে ব'লে! না মা, চুপ কর তুমি, ওর আজ খাওয়া বন্ধ।"

সেই একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐটুক্ মেয়ে, এমন ভাবে তদ্বির করিল মামলাটা যে, সেই থেকে আর ওদিক দিয়া যাই নাই।

যাক, ভালবাসার কথা তুলিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম; কিন্তু আসলে অনেক দূর আসিয়া পড়ি নাই, ভালবাসা সমান্তরালেই চলিতেছে। সেটা একদিন টের পাওয়া গেল। -

তখন কুন্তলার বয়স বছর আষ্টেক হইয়াছে। অর্থাৎ আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আরও এক বছরের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। বাঘও যেন এখন গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, কুন্তীকে যে এখন কিসের মত ভয় করি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।—তাড়কা রাক্ষসী? চীনের ড্রাগন? ঐরকম একটা কিছু হইবে, কেন না, দৃষ্ট জগতে কোন তুলনা পাওয়া যাইতেছে না।

তাড়কার সঙ্গে অন্যদিক দিয়াও একটা সাদৃশ্য ছিল কুন্তলার। সে

মায়া জানিত। ওদিককার কথা বলিয়াইছি; সে আমার মধ্যেও মোহ আনিত।

বেশ মনে আছে সেদিনের কথা, আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি, কুন্তলা আসিয়া একবার এটা নাড়িয়া, একবার ওটা নাড়িয়া পাশে আসিয়া বসিল। আমি ভয়কণ্টকিত হইয়া একবার আড়চোখে দেখিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলাম।

কুন্তলা ডাকিল, "শৈল!"

ফিরিয়া চাহিতে কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা পান বাহির করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "খাবি?"

মারাত্মক ছিল তাহার হাসিটা। অমন নিরীহ হাসি দেখা যায় না; যেন সে মেয়েই নয়। অঙ্ক কষিতে কষিতেই বলিলাম, "হ্যাঁ, খাই, আর তুই গিয়ে বাবাকে বলে দে, পান খেয়ে মুখ রাঙা করেছি।"

ফিরিয়া চাহিলাম। কুন্তলা হাসি-হাসি মুখটা অভিমানে তোলোপানা করিয়া লইযাছে। বলিল, "বেশ, না খাবি খাসনি, বদনাম দিস্ কেন? চুরি করে এনেছিলাম তোর জন্যে, তাই বললাম।"

"দে, কিন্তু–" বলিয়া পানটা লইয়া মুখে পুরিয়া দিলাম।

বেশ যখন মজিয়া আসিয়াছে, অপটুতার দরুন মুখের দুই কোণ আর ঠোঁট দিয়া রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, কুন্তী হঠাৎ উঠিবার ভান করিয়া বলিল, "চললাম বলতে।"

বিবর্ণ মুখে উঠিতে যাইব, ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, "না রে না, খা তুই। আমি কি এতই বেইমান?"

অনেক রকম আগড়ম-বাগড়ম কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বেশ যখন ভয়ভাঙ্গা হইয়া কতকটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি, কুন্তলা যেন নিছক কৌতূহলচ্ছলেই প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা শৈল, পিথিবীর মধ্যে তুই সক্কলের চেয়ে কাকে ভয় করিস—স-ক্কলের চেয়ে?"

দুরবগাহ নারীর মন, কে অত বোঝে?

বলিলাম, "সেকেন্ মাস্টারকে কুন্তী, সুধু আমি কেন, সব ছেলে ভয় করে—যমের মতন। না হলে দেখ না, দশটা বেজে গেছে, এখনও বসে বসে তার অঙ্ক কষছি! পনেরোটা অঙ্ক হোমটাস্ক দিয়েছে ঠেলে, একটিও বাদ পড়ুক দিকিন!"

"তোর হয়েছে সব?"

"না হয়ে উপায় আছে? এইটে শেষ, এই পাঁচখানি পাতা বোঝাই অঙ্ক।"

অঙ্কটা শেষ করিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলাম, "বা-ব্বাঃ, আর মাত্র পনেরো মিনিট! আজ আবার পয়লা ঘণ্টাতেই সেকেন মাস্টার!"

কুন্তলা বলিল, "তুই খেয়ে নিগে তাড়াতাড়ি শৈল; আমি ততক্ষণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সব রেখে দিচ্ছি। কোন্‌গুনো সব বল দিকিন?"

চটিতে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আঙুল দিয়া ছড়ানো বই, খাতা, পেন্সিল সব দেখাইয়া দিয়া বাড়িতে চলিয়া গেলাম।

* * *

এর পরে একবার স্কুলের দৃশ্যটা উদ্ঘাটন করা যাক। মনের স্ফূর্তিতে ফার্স্ট বেঞ্চে বসিয়া আছি। সেকেণ্ড মাস্টার আজ পিছনের বেঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন একটি সাইক্লোন-ঝড় বহিয়া আসিতেছে, কোন ছেলে বেঞ্চের নিচে লুটোপুটি খাইতেছে, কেহ হাই বেঞ্চে মাথা গুঁজিয়া পিঠ রগড়াইতেছে, কেহ, 'আর নয় স্যার, মরে গেলাম' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, কেহ বেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, সীটে ফিরিয়া আসিতে সাহস নাই। এক রকমারি কাণ্ড!

সেকেণ্ড মাস্টার আমার সামনে আসিয়া বলিলেন, "আপনি ?"

"হয়েছে স্যার সবগুনোই।" --বলিয়া তাড়াতাড়ি খাতা খুলিতেই চক্ষু-স্থির! আজকের অঙ্ক যাহাতে কষা ছিল, সেই পাঁচখানি পাতা একেবারে বেমালুম সাবাড়!

সেকেণ্ড মাস্টারের ভীষণতার উপরে একটা সরসতার আবরণ থাকিত সে আবার আরও ভীষণ; সেকেণ্ড মাস্টার একটু রহস্যপ্রিয় ছিলেন, সবাই এটাকে শিবু-মাস্টারের 'খেলিয়ে মারা' বলিতাম।

ঠিক যেন অঙ্কগুলার উপর দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুলাইয়া যাইতেছেন, এইভাবে তিনখানি সাদা পাতা এক এক করিয়া উল্টাইয়া দেখিয়া গিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, সবগুনোই ঠিক হয়েছে, বাঃ, বেশ ছোকরা শৈলেন, তুই নিজেই সবগুনো করেছিস?"

আমার তখন ধড়ে আর প্রাণ নাই। শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, "সব করেছিলাম স্যার, কিন্তু—"

"নেই বুঝি খাতায়? আমি ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই সূক্ষ্মরূপে আছে কোথাও: অংকও কষবে না, আবার মিছে কথাও বলবে, একখনও হতে পারে? শৈলেন কি আমাদের সেই রকম ছেলে যে—"

তাহার পরেই মার। সে যে কি মার বলিয়া বোঝান যায় না, ডেস্কের নিচে থেকে বেঞ্চের নিচে গেলাম তাহার পর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম, বেত্রবর্ষণ অপ্রতিহত ধারায় চলিয়াছে, বুক, পিঠ, হাঁটু, কব্জি আঙুল—কোন জায়গা বাদ নাই—বেতটা গেছে ফাটিয়া তাহার ঝুরিগুলা যেখানে পড়িতেছে, যেন গাঁথিয়া বসিয়া যাইতেছে।

অনেক ছেলেবেলায় কি করিয়া মাথার ডানদিকে এক জায়গায় কাটিয়া গিয়া একটা দাগ ছিল, শেষে বেতটা তাহার উপর পড়িয়া পাতলা চামড়াটা ফাটাইয়া দিতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইলে সেকেণ্ড মাস্টারের রাগ পড়িল। অবশ্য না পড়িলেও তখন আমার পক্ষে বিশেষ ইতরবিশেষ ছিল না, কেন না, তখন আমার অনুভব করিবার চৈতন্য একেবারে নিম্নপর্দায়।

আমায় বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ভালবাসার প্রসঙ্গটা ভুলি নাই, সেই কথাতেই আসিতেছি।

তাহার পরদিন বিছানায় শুইয়া আছি। জ্বর, সমস্ত গায়ে বেদনা, মাথায় একটা পটি বাঁধা। পাশে বসিয়া আছে কুন্তী গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, কিছু দরকার হইলে যোগাইয়া দিতেছে। দারুণ অভিমানে সেবা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু আবার অভিমানের বশেই গ্রহণ করিতেছি,—ও দেখুক, নিতান্ত অকারণেই ও কি দশা করিয়াছে আমার।

হঠাৎ একবার কি ভাবিয়া কুন্তী মাথাটা আমার মুখের কাছে লইয়া আসিল, একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "পাতাগুনো কেন ছিঁড়ে রেখেছিলাম, বলব শৈল?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন আবার?—বদমাইসি। তোর কি করেছিলাম আমি যে—!" গলার স্বর আমার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কুন্তী আমার কাঁধে হাত দিয়া মুখ আরও নামাইয়া বলিল, "বদমাইসি

না শৈল, তোকে বড্ড ভালবাসি ব'লে। মাইরি বলছি, যত তোকে লোকে বকে, মারে তোর যত কষ্ট হয়, তত তোকে এত্ত ভাল লাগে শৈল, কি বলব! তোর মুখটা যদি সব্বদা বেশ শুকনো শুকনো থাকে, তোকে চমৎকার লাগে। এই তোর কাছে বসে আছি, বেশ লাগছে। মাইরি বলছি, মাইরি, না পেত্যয় যাস, দেখিস, সমস্ত দিন উঠবই না তোর কাছ থেকে। তোকে খুব ভালবাসছি যে এখন, বে—শ, চমৎকার লাগছে। যত্ত তোকে বেশি মারে লোকে, তত্ত তোকে ভাল লাগে, মাইরি বলি, শৈল। মনে হয়,—আহা শৈল বেচারিকে মারলে অমন করে! তোকে ভালবাসি বলেই তো মনে হয শৈল, বিশ্বাস করলি নি?..."

* * *

আপনি বিশ্বাস করিলেন?

কিন্তু বিশ্বাস করিলেন, কি না করিলেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। ভালবাসার মূল কথা অধিকার-স্পৃহা। আমাদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে ওটা আরও প্রবল, তা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন; কেননা, একেবারে মেষে পরিণত করিয়া ফেলিবার চক্রান্তটা ওদেরই; কিন্তু ইহার সঙ্গে আবার একটা করুণার ভাবও মিশ্রিত থাকে—একটা "আহা বেচারি"—এই রকম ভাব। তাহার কারণ আমরা সুধু ভাবি (ভুল করিয়া ভাবি) মেয়েরা অবলা সরলা, ওরা জানে (পাকারকম জানে) আমরা দুর্বল, বোকা, অসহায়। সেইজন্য বোধ হয় নারী যতটা ভালবাসিতে পারে, পুরুষ ততটা পারে না। আমরা সুধু খাঁটি ভালবাসা বাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকি, ওরা ভালবাসার সোনায় করুণার রঙ চড়াইয়া কণ্ঠে পরে। সখ হইলে রঙটা ইচ্ছামত গাঢ় করিয়া লয়, যেমন করিয়া লইয়াছিল কুন্তলা। কুন্তলার ওটা ভালবাসাই ছিল, নারীর ভালবাসারই একটা অভিব্যক্তি। ও ছোট বলিয়া ওর কথাটা অবিশ্বাস করুন, কিন্তু বড়র ভালবাসায় এই জিনিসটিই বড় আকারে পাইতে পারেন, সতর্ক করিয়া দিতেছি। এ পর্যন্ত বলিতে পারি, করুণা উদ্রেকের অন্য উপায় না থাকিলে, অর্থাৎ শিবু-মাস্টারের অভাব ঘটিলে ওঁরা সে-ব্যবস্থাটা নিজের হাতেই তুলিয়া লন, মানুষের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণেরও অভাব নাই।

নারীপ্রেমের সহস্রবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে একটার দৃষ্টান্ত দিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম। বিশ্বাস করেন, আরও দেওয়া যাইবে।

পরিশেষে অমর কবি Shakespeare-এর 'Twelfth Night' থেকে দুইটা লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না :

Viola. I pity you.

Olivia. That's a degree to love.

সবজান্তা

নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া লিখিতে বসিয়াছি। শুনিলাম, রান্না-বান্না নাকি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

'শুনিলাম' কথাটাতে আপনারা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন দেখিতেছি! ভাবিতেছেন বোধ হয়—রসনা কোথায় ছিল? রসনা অবশ্য যথাস্থানেই ছিল; তবে আহার্যের—প্রকৃত আহার্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় নাই বেচারা। এটা নিশ্চয় মানিবেন যে আহার্য উপার্জন করিতে হইলে রসনার আর একটি শক্তিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন—অর্থাৎ বাচনিক শক্তি। অবস্থা-বিপর্যয়ে বেচারি সেইটি পারে নাই। আশা করি এবার একটা শিক্ষা হইল।

নিমন্ত্রণ যেখানটায় ছিল সে জায়গাটা আমাদের সহরের বাহিরে, প্রায় মাইল চারেক দূরে। জায়গাটি নিজেই একটি ছোটখাট সহর; কাছাকাছি থাকায় আমাদের সহরের সঙ্গে নাড়ির একটা যোগ আছে, তবে দূরত্বটা নেহাৎ অবহেলার নয়, তাই দুইটি জায়গায় বাসিন্দাদের মধ্যে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ এমনও নয়। যাহাদের সঙ্গে বিষয়-কর্মের কোন যোগ আছে তাহারা অল্প-বিস্তর চেনা, বাকি সকলের মধ্যে পরস্পরের দেখা হইলে, মাথা নুয়াইয়া একটি ছোট্ট নমস্কার—'কেমন আছেন?' 'ভাল তো?'—ঐ পর্যন্ত।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে পদার্পণ করিতেই গৃহকর্তা হলধরবাবুর সহিত দেখা হইল। বলিলেন, "আসুন, আসুন; বহুদিন পরে দেখা। আমিও এদিকে কাজটার হিড়িকে আর বেরুতে পারিনি। তারপর, খবর সব ভাল তো?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, ভালই একরকম; কাজটি বেশ সুসম্পন্ন হয়েছে তো?"

এই সময় বাঁ-হাতে খুব বড় খোলের হুঁকা টানিতে টানিতে একটি কৃশ, খর্বাকৃতি ভদ্রলোক চঞ্চলপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হুঁকাটা নিজের মুখ হইতে নিজেই যেন ছিনাইয়া লইয়া—চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া হলধরবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ্যাঁ! তুমি এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করছ হলধর? ওদিকে সেই থেকে তোমায় খুঁজে খুঁজে আমার পায়ের সুতো

ছিঁড়ে গেল। বলি তোমার ইয়ের যোগাড় হয়েছে?...ঐ যে গো, কি যে বেশ বলে—দেখ, মনেই আসছে না, এত বে-বন্দোবস্তয় কি মাথার ঠিক থাকে?" ডান হাতে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

হলধরবাবু একটু 'কিন্তু' হইয়া বলিলেন, 'এই এঁর সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম, মধুকাকা; আমাদের শৈলেনবাবু, নাম শুনেছেন নিশ্চয়?"

মধুকাকা কি মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ভুলিয়া, এক পা পিছাইয়া আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হুঁকাটা আরও দূরে সরাইয়া চোখ দুইটা আরও কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আরে! আমাদের সেই শৈলেনবাবু? কৈ তুমি তো এতক্ষণ আমায় বলনি হলধর! আমি আজ গাড়ি থেকে নেমে ওবধি কত লোককে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের শৈলেনবাবুকে বলা হয়েছে কি না--শৈলেনবাবু আমাদের কখন্ আসছেন—"

হলধরবাবু নিশ্চয় এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং এতটা আগ্রহ প্রত্যাশা করেন নাই, আবার একটু 'কিন্তু' হইয়া বলিলেন, "এইমাত্র এলেন কি না শৈলেনবাবু। আপনার কথায় মনে হচ্ছে কাকা, যে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ রয়েছে পূর্ব থেকে।"

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়াছিলাম, কেননা হাজার চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছিলাম না যে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি। এখানে তো নয়ই। কথাবার্তার ভাবে বোধ হইতেছে এখানে থাকেও না। তবে?

মধুকাকা কিন্তু খুব সপ্রতিভ।

হলধরবাবুর প্রশ্নে আবার চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আলাপ! সে আজকের আলাপ না কি? শৈলেনবাবুকে আজ দেখছি? হলধর হাসালে শৈলেনবাবু—বলে শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে দেখছি! আপনার সঙ্গে যেন আজকের পরিচয়! সেই ইয়ের কথা মনে আছে? অবশ্য বহুদিন হয়ে গেল।"

আমি স্মৃতিশক্তিকে আলোড়িত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিলাম, "আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায়?"

'আরে! আমাদের সেই শৈলেনবাবু?'

কি খুব মনে আছে সে-সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ধারণাই নাই। তবে ও-প্রশ্নের আমার মুখে আর ও-ভিন্ন উত্তর ছিল না।

* * *

আমার এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা আছে।--

ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট নমস্কার করিবার জন্য কপালে হাত তুলিতে গিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। "বাই জোভ! আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মশাই! দাঁড়ান,—"

মনে করিবার জন্য রগ দুইটা টিপিয়া একটু পরে তর্জনীটা উঁচাইয়া বলিল, "হয়েছে! লালগোলায়, স্টীমার ঘাটে।"

জন্মে কখন লালগোলা ঘাট দেখি নাই। কিন্তু ঘায়েল হইলাম; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম,—"হবে—"

"হবে কি মশায়! অবধারিত সত্য। আচ্ছা, লালগোলা ঘাটের দিকে কখন গিয়েছিলেন কি না বলুন তো—খুব মনে করে দেখুন।" স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি এত জোরে মনে করিলাম যে, কপালে ঘাম জমিয়া গেল। বলিলাম, "একবার যেন গিয়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে কি মশায়! নিশ্চয় গিয়েছিলেন। আমার তো ভুল হবার কথা নয়। অত ভুল হলে কি একলা মানুষ এতগুলো ইনসিওরেন্সের ব্যাপার সামলাতে পারতাম? দাঁড়ান—গাড়ি থামতেই বৃষ্টি নামল—গাড়ি লেট, ওদিকে স্টীমার ছাড়ে—ভিজে চুপসে গেছেন, সুটকেশসুদ্ধ—টেনে ছাতার মধ্যে নিয়ে নিলাম, আপনাকে সামলাতে নিজে পিছলে আছাড় খেলাম—মনে পড়েছে এবার?"

অল্প হাসির সহিত আবার অপলক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, এইবার পড়েছে মনে।"

লালগোলার ঘাটে কবে আছাড় খাইয়াছিল জানি না, তবে আমায় আপাতত প্যাঁচে বাগাইয়া দিব্য এক আছাড় দিল। নিরুপায় ভাবে ইন-সিওরড হইলাম।

দোকানে গিয়া বলিলাম, "শাড়ি দেখাও দিকিন।" ছোকরা বেচনদার প্রশ্ন করিল, "কি রকম শাড়ি দেব?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গদির ওপর হইতে দোকানী ছোকরাকে এক ধমক দিল, "খদ্দের চেন না?—আবার জিগ্যেস করছ? বের কর মাদ্রাজী, শান্তিপুরী আর গুজরাটী শাড়ির গাঁট ক'টা।..খদ্দের 'এই জিনিস চাই' বলেই খালাস, তারপর চোখের সামনে তাঁর পছন্দসই জিনিস বিছিয়ে দিয়েছি—আর আজকালকার এইসব ছোকরাদের দেখুন না—কি রকম শাড়ি

যদি খুঁটিয়েই বলবেন তো তুই কি করতে আছিস? তা ভিন্ন বাবু কি এই আজ প্রথম এসেছেন? বছরের মধ্যে বোধ হয় কম করে ধরলেও আট দশ খেপ মাল নিয়ে যাচ্ছেন, তবুও ভুল করবি? আরে গেল!"

অবশ্য সে দোকানে এই প্রথম যাওয়া। কিন্তু সে কথা বলা গেল না। আটপৌরে একজোড়া শাড়ির দরকার ছিল। দুইজোড়া মাদ্রাজী আর এক-জোড়া দামী শান্তিপুরী লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

স্টেশনে নামিলে, তাহারই গাড়িতে নিত্য চড়ি,—চেনা লোক, বলিয়া ড্রাইভার লগেজসুদ্ধ একরকম জবরদস্তিই নিজের গাড়িতে টানিয়া তুলিয়াছে—এমন ঘটনা আমার জীবনে বিরল নয়।

এই সবে ক্রমেই একটা ধারণা কেমন বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, কে আমায় চেনে, কাহাকে আমি চিনি, কি কি ঘটনা সব আমার জীবনে কবে, কোনখানে ঘটিয়াছে, এ-সব সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নাই, জোর করিয়া কিছু বলা নিতান্ত অশোভন। সব চেয়ে নিরাপদ—যাহারা একটু জোর করিয়া বলিবার শক্তি রাখে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ।

*　　　*　　　*

তাহাই করি; হলধরের কাকাকে বলিলাম, "আজ্ঞে খুব মনে আছে, সে কি ভোলা যায়?"

হলধরবাবু বলিলেন, "তবে কাকা, আপনি ততক্ষণ শৈলেনবাবুর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করুন, কোণের ঘরটা খালি আছে। আমি একবার ওদিকে- "

মধুকাকার শীর্ণ মুখে খুব হৃষ্টপুষ্ট একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ। তাচ্ছিল্যের হাসিতে সেটা আরও ফুলাইয়া বলিলেন, "আরে সে তুমি বলবে তবে? এতদিন পরে শৈলেনবাবুকে পেয়েছি আমি, ছেড়ে যেতে পারি কখনও, না উনিই আমায় ছাড়বেন? কি বলুন শৈলেনবাবু?"

ক্লান্তি—এবং এরই হাতে সমর্পিত হওয়ার জন্য নিরাশার মধ্যে আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—"বিলক্ষণ! তা কখন পারি? কতদিন পরে দেখা.."

হলধরবাবু চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—

"তাহ'লে আর একটা কথা বলে যাই কাকা, জায়গা হ'লে আপনি ওঁকে একটু দেখবেন—যেন সাটের মধ্যে বসে ওঁর খাওয়ার কোন বিঘ্ন কি অসুবিধে..."

একটা জরুরী কাজে ওদিক থেকে কে ডাকিল, "হলধরবাবু!"—"তাহ'লে আসি কাকা, নিশ্চিন্দি রইলাম," বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল—জায়গা হইয়াছে।

ক্ষুধায় নাড়ি চন্ চন্ করিতেছিল। প্রথমত চার মাইল পথ ছ্যাকরা গাড়িতে অতিক্রম করার জন্য, দ্বিতীয়ত, অসহায়ভাবে মধুকাকার গল্প শুনিতে শুনিতে। হেন বস্তু নাই যা লোকটা জানে না, হেন জায়গা নাই দেখে নাই, হেন মানুষ নাই চেনে না!...বদরিকাশ্রম, রেঙ্গুন, জওহরলালের পারিবারিক জীবন, হাওড়ার নূতন পুলের কন্ট্রাক্ট,—এসব সম্বন্ধে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এর পূর্বে কোথাও পাই নাই। অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। আহারের ডাক পড়িতেই—"তাহ'লে ওঠা যাক্ এবার"—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একটি স্বস্তির নিশ্বাসও পড়িতে যাইতেছিল, মধুকাকা আস্তিনে টান দিয়া বলিলেন—"বসুন একটু।"

মুখের দিকে চাহিয়া চতুর দৃষ্টি হানিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "বুঝেছেন ত?"

বুঝিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, ক্ষুধার চোটে চিন্তার শক্তিও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, তবু হতাশ দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব বুদ্ধির দীপ্তি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া হাসির অভিনয় সহকারে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঠিক।"

বসিয়া দেখিতে লাগিলাম—একটু সুবিধামত জায়গা পাইবার জন্য নিমন্ত্রিতের দল ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র তৃণাসন, সামনে কাঠি দিয়া গাঁথা শুষ্ক জীর্ণ কয়েকখানি শালপত্র, পাশে আকারহীন একটি মৃৎজলাধার—মানব-সভ্যতার একেবারে আদিযুগের সাক্ষ্য। হায়, তাও বুঝি আজ অদৃষ্টে জুটিল না।

শেষ লোকটি পর্যন্ত যখন চলিয়া গেল, মধুকাকা বলিলেন, "উঠুন এবার, কি বলেন?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, এইবার ওঠা চলে।"

ঘরে, বারান্দায়, ততক্ষণ সমস্ত আসন অধিকৃত। লোলুপ দৃষ্টিতে

সুদূর কোণটি পর্যন্ত সন্ধান করিলাম, সব ভর্তি। পরিবেশকরা লুচি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিঙের সম্বরা-দেওয়া কুমড়ার ছক্কা আর টাটকা লুচির একটা অপরূপ মিশ্র সুবাস উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে চারিদিকেই বুভুক্ষু স্বাস্থ্যের একটি মিষ্ট কলরব।... কি জোর কপাল এদের!

মধুকাকার ভ্রূক্ষেপ নাই, মোটা গোঁফজোড়ার পিছনে লিক্‌লিকে শরীরটি লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া ডিঙাইয়া চলিয়াছেন—তাঁহার উপরেই যেন আজকের সবচেয়ে গুরুভার, ভাবটা ঠিক এই রকম। শুধু বারান্দায় পহুঁছিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন "ওপরে চলে আসুন।"

অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওহে পথ ছাড় দিকিন। আহা, ক'রো'খন পরিবেশন, শৈলেনবাবু!- দেখতে পাচ্ছ না?... ডিঙিয়েই আসুন না পাতটা মশাই, ছেলে মানুষ ওরা, দোষ কি? এই দিকে ..এই যে, নমস্কার,... আমাদের শৈলেনবাবু—চেনেন বোধ হয়, ভিড়ের মধ্যে তো ওঁর চলবে না। একটু ব্যবস্থা করে দিগে... আসুন শৈলেনবাবু, চলে আসুন -অত জড়সড় হয়ে চললে কি নেমন্তন্ন-বাড়িতে চলে?... শৈলেনবাবু আমাদের চিরকালটা সেই একভাবেই রইলেন।"

ছাদেও অনেকগুলি লোক বসিয়াছে তবে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। মধুকাকা একটি পংক্তির শেষ দিকে আমায় লইয়া দাঁড়াইলেন। একটি যুবক লুচির ঝুড়ি লইয়া যাইতেছিল, হাঁক দিলেন এবং সে নিকটে আসিলে বলিলেন, "রাখ দিকিন।. একটি আসন নিয়ে এস—দু'খানা, নৈলে বসতে কষ্ট হবে শৈলেনবাবুর.. আরও একটু তফাৎ করে বেছাও... হয়েছে... তিন-খানা পাতায় কি দরকার ওঁর। মিতাহারী সদাচারী লোক...তা দিয়েছ দাও, নেড়ে-চেড়ে খেতে সুবিধে হবে।

"নিন্, এবার বসে পড়ুন শৈলেনবাবু। কোন ভাবনা নেই, এই আমি গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

"নাও, এইবার লুচি দাও।"

ছোকরা খান দশ-বার লুচি গুছাইয়া লইয়া পরিবেশন করিতে যাইতেছিল। মধুকাকা, "হাঁ—হাঁ, কর কি!" বলিয়া অর্ধেক দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর ডান হাতের দুইটি আঙুল বিস্তারিত করিয়া বলিলেন—

"তিনখানি—হুন্দ চারখানি—খুব ফুলকো, গরম গরম বেছে, ব্যস—শৈলেন-বাবুর খোরাক জান না?... আপনাকে ভেবেছে কি এরা মশাই? চারখানাই দিক্—না তিনখানা?"

লুচির গোছার পানে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস জোরে চাপিয়া বলিলাম, "না, চারখানা চলবে না।"

মধুকাকা বিজয়ানন্দে তর্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন, "'চলবে না,' ঐ শোন। শৈলেনবাবুর খোরাক আজ দেখছি? হুঃ.. তিনখানা, হুন্দ চারখানা। আজ কিন্তু রাত হয়ে গেছে কত! আর এতটা পথ যেতে হবে না? কিন্তু তাহ'লেও তুমি দাও চারখানাই, কোন রকমে বাজি করব শৈলেনবাবুকে।"

লুচির ওদিকে জোর তাগাদা চলিয়াছে, আড়চোখে দেখিলাম, বুদ্বুদের মতই শুভ্রকান্তি চক্রগুলি পড়িতে না পড়িতেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ওদিকে চার পাঁচ জন হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, জোগান দিতে পারিয়া উঠিতেছে না। এ ছোকরারও টান পড়িল। মধুকাকা বলিয়া দিলেন, "বেগুন ভাজা পাঠিয়ে দাও।"

তাহার পর ডাকিলেন, "ওহে জলের ভাঁড়!"

একটি ছোট ছেলে জল দিতেছিল, উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'ভাঁড়টি রাখতো বাবা; একটি ভাঁড় এইখানেই লেগে যাবে, শৈলেনবাবুর জলের টান জাননা তো! তুমি এই ছিলিমটি পালটে নিয়ে এসতো বাবা... রামজীবন চাকরকে চেন তো? যাও, খাসা ছোকরা, বাঃ!"

বেগুন ভাজা আসিল।

মধুকাকা বলিলেন, "দাও।... না দু'খানাতে হবে না, আরও দু'খানা দাও। ওটি ওঁর চিরকালের পেয়ারের জিনিস—জানা আছে কি না। তোমার হাতে কি হে?"

বেগুনের পিছনে ছিল কুমড়ার ছক্কা। ছোকরা এক হাতা তুলিতেই মধুকাকা হাত উঁচাইয়া বারণ করিয়া উঠিলেন, "না, ও চলবে না। হিং দেওয়া তো? উনি ওটা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। ..না, দেবে একটু, শৈলেনবাবু? কি রকম রাঁধলে দেখতেন একটু,—বেশি জেদ করছি না। সামান্য একটু, আরে খাতিরে পড়েও তো ঢেঁকি গেলে লোকে।"

নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি কোন রকমে মাথা তুলিয়া আঙুল কয়টি জড় করিয়া বলিলাম, "খুব সামান্য দেবেন।"

ছোকরা আধ-হাতা তুলিয়াছিল, মধুকাকা ব্যস্ত হইয়া উঠায় তাহারও অর্ধেকটা ঝাড়িয়া রাখিয়া বাকিটুকু অতি সন্তর্পণে আমার পাতে দিয়া দিল। মধুকাকা বলিলেন, "যাও, ডাল পাঠিয়ে দাও।"

আহার করিতে লাগিলাম। ততক্ষণে আশে-পাশের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমার মিতাহার সম্বন্ধে বেশ একটি চাঞ্চল্যকর কৌতূহল পড়িয়া গেছে। ক্ষুধায় পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পাছে একটুও ব্যস্ততা লক্ষিত হইলে মধুকাকার কথার সঙ্গে না খাপ খায়, সেই ভয়ে সেই চারখানি লুচি, বেগুন ভাজা আর বড়ি পরিমাণ ছক্কাকে যতটা সম্ভব টানিয়া বাড়াইতে লাগিলাম।

মধুকাকা আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "আপনি খুব রয়ে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খান, শৈলেনবাবু, আমি রয়েছি।"

যাহাকে কলিকা বদলাইতে পাঠান হইয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া আঙুলের টোকা দিয়া আগুনটা ঠিক করিতেছেন, এমন সময় যে ছোকরা ছক্কা দিয়া গিয়াছিল সে পিতলের বালতিতে ডাল লইয়া উপস্থিত হইল এবং হাতাটি ডুবাইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিল। খানিকটা স্বর্ণাভ ডালের সঙ্গে আধখানা রুই মাছের মুড়া আমার পাতটিতে গড়াইয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গেই হুলস্থুল কাণ্ড! মধুকাকা হুঁকাসুদ্ধ এক রকম প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! করলে কি হে! সব মাটি? এতক্ষণ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসে শেষকালে দয়ে মজালে? শৈলেনবাবু রাত্তিরে মাছ খান না, বরাবর সবার একথা জানা—আর নাই জান, দেখছ তো কত সামলে কি করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছি... হিং-এর গন্ধ বলে ডালনাটাতে পর্যন্ত এখনও হাত দেন নি, আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে একহাতা মুড়োসুদ্ধ ডাল হড় হড় করে ঢেলে দিলে! কি রকম বেয়াক্কেলে ছোকরা! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই... দেখছ, ঐ জন্যে আমিষ থেকে আলাদা করে বসিয়ে কত হেপাজৎ করে খাওয়ান হচ্ছে... এইটুকুও যদি বোঝবার ক্ষমতা নেই তো পরিবেশন করতে নেমেছ কেন বাপু?"

লোক জড় হইয়া গেছে। নিমন্ত্রিতদের হাত বন্ধ, "কি হ'ল?... শৈলেনবাবুর খাওয়া গেল বুঝি?...না হয় অন্য একটা পাতা করে দিক না, একটু জিগ্যেস করে দিতে হয়, নিয়মই তাই পরিবেশনের।"

ছেলেটি তো লজ্জায় অপমানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে—কতকটা অবস্থাগতিকেও, কতকটা চোখের নিচেই মসলা আর ঘৃতপক্ক নধরকান্তি মাছের মুড়াটার জন্য। কিন্তু মিতাহারের যশটা তখন ঘাড়ে জাঁকিয়া বসিয়াছে, অবশ্য অপযশের চেয়েও গুরুভার এবং দুর্বহ, কিন্তু ঝাড়িয়া ফেলি সে-ক্ষমতা আর আমার নাই তখন।

তবুও বলিলাম, "একটা ভুল করে বসেছে ছোকরা, কি আর হবে, আমি ওগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখছি পাতের ধারে।"

ছেলেটির জন্য কষ্ট হইতেছিল সত্য; কিন্তু পাতের একপাশে ঠেলিয়া রাখিবার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এখন আপনাদের বলিতে লজ্জা নাই। আশা ছিল, পাতের একপাশে থাকিলে কখন কখন একটু গড়াইয়া আসিবে; মধুকাকা-বর্ণিত পেয়ারের বেগুন যেন বিষ হইয়া উঠিতেছিল।

হায় রে দুরাশা!

মধুকাকা মাথা নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে না, না, না; আপনি ভালমানুষ, বলবেনই, কিন্তু আমি বসে থেকে সেটা কি হ'তে দিতে পারি? হলধর আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি আছে। না, পাতা সরিয়ে অন্য পাতা করে দাও। এইবার নিয়ে এস তিনখানি লুচি—একেবারে কড়া থেকে—থাক্ দু'খানিই নিয়ে এস, একটা বিঘ্ন হয়ে গেল, চাপ খাওয়া খাইয়ে কাজ নেই, খান দু'এক বেগুন ভাজা...ছক্কা উনি ছোঁন নি, কাজ নেই জবরদস্তি করে—আর যাও, নিরিমিষ ডাল, কপি আছে? হিং টিং দেওয়া নয়? নিরিমিষ তো?—নিয়ে এস তাহ'লে। গেরো ঘটিয়েছিল আর কি।"

আমার পাশেই একটি বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে পোয়াটাক ওজনের একটা ল্যাজা লইয়া কসরৎ করিতেছিলেন, এত গোলমালেও বিরাম ছিল না; এবার তাহার শেষ কাঁটাটি পরিতোষ সহকারে চুষিয়া লইয়া বলিলেন, "মাছ-মাংস হ'ল আসুরিক আহার, চল্লিশের পর এসব ছেড়ে দেওয়াই ভাল; উনি ঠিকই করেছেন।"

প্রথম ক্ষুধার দাপটটা কমিয়া গিয়াছে। সকলের, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে সংযত আহারের প্রশংসাটা বেশ ছড়াইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমারও যশটা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিল এবং অচিরেই আমি শূন্যপাত্র সমেত সকলের পরম দর্শনীয় হইয়া পড়িলাম।

নিরামিষ ডাল আর কপি আসিল। কপিটা পুড়িয়া গিয়াছে; কাজের বাড়িতে অল্প ও আলাদা করিয়া রাঁধা নিরামিষ তরকারিগুলা প্রায়ই যায়। তবুও তাহাই অমৃতস্বাদে দু'একবার মুখে দিয়াছি, এমন সময় শব্দ হইল "ধোঁকার ডালনা! ধোঁকার ডালনা চাই? ধোঁকা"

আমি হাত বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া মুখ তুলিলাম, আশায়, আনন্দে বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতেছে, আসল আমিষ তো পোড়া অদৃষ্টে জুটিল না, গিলটিকরা আমিষে তবু যদি একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

"ধোঁকা! ধোঁকার ডালনা!"

একটি কালো, নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন গোছের যুবা মালসা লইয়া পরিবেশন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে; মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ দেবদূত। পিছন হইতে, অন্য পংক্তি হইতে তাগাদা আসিতেছে, "ধোঁকাটা একবার দেখিয়ে যাবেন মশাই! একবার ঘুরে যেও ভাই"

রসিক গোছের কে একজন বলিল "একবার এস দাদা সত্যিই যেন ধোঁকা দিও না!"

মধুকাকার হুঁকার ঘড়ঘড়ানি শুনিতেছি। সিধা হইয়া বসিয়া অপলক নেত্রে ধোঁকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মোগলাই গন্ধটা ক্রমেই বাতাসটাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। পলিতদন্ত বৃদ্ধ স্খলিতস্বরে বলিলেন "আর ফিরে ক'বার আসবে, হ্যাঁ—ও একেবারেই খানিকটা দিয়ে যাও।" পাতের মাঝখানটায় বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। একরাশি ধূমায়মান ধোঁকার সুবাস ভুরভুর করিয়া উঠিল।

তাহার পরই একটু জায়গা ছাড়িয়া আমার পাতা। হাতায় তুলিয়া দিতে যাইতেই মধুকাকা উঠিয়া পড়িলেন এবং হাতে হুঁকা ধরিয়া কোমর আর ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও ঢেলে, মালসাসুদ্ধ, ছেড় না। আমি সেই থেকে লক্ষ্য করে আছি কি না দেখি কি করে... ডালের বেলা একবার ঘা খেয়ে শৈলেনবাবু পাত ছেড়ে সোজা হয়ে বসে আছেন, পাছে

ভুলের চোটে আবার একটা বিভ্রাট ঘটে, তা তোমাদের কি বোঝবার কোন ক্ষমতা আছে? আপনি মুখ ফুটে বলবেন শৈলেনবাবু, যেটা খেতে চাইবেন, যেটা না চাইবেন, এত লজ্জাই কি, আর সংকোচই বা কি?—শেষে...।"

কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, দারুন ক্ষুধায় বয়স-নির্বিচারে সকলকেই ছেলেমানুষ করিয়া তোলে। আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া গিয়াছিলাম, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিলাম, "এই বারণ করতে যাচ্ছিলাম আর কি...।"

বৃদ্ধ একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ধোঁকাও খান না?"

মধুকাকা বলিলেন, "না, শৈলেনবাবুর প্রাণ ওতে সায় দেয় না। ওটা আত্মাকে একটা প্রবঞ্চনা কি না। মাংস খাব না তো আসল নকল কিছুই খাব না—এই হচ্ছে শৈলেনবাবুর কথা। ওঁকে তো আজ থেকে দেখছি না।"

বৃদ্ধ মুখের ধোঁকার রসে একটা সকারবহুল শব্দ করিতে করিতে বলিলেন, "কথাটা অতি উত্তম—মাংস যখন খাব না, তখন ধোঁকা খেয়ে আত্মাকে বঞ্চনা করি কেন—বাঃ, সাধু!...তবে দেবার জন্যে ছোকরা যখন তুলেছে তখন আবার রেখে না দিয়ে.."

নিরাশায় এবং তাহার উপর আবার সাধুবাদের অত্যাচারে পিত্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল, যথাসম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"না, না, রেখে দেবে কেন, আপনাকেই দিক্ না, কতটুকুই বা, দাও ভাই ঐ পাতে দিয়ে দাও..."

বৃদ্ধ হাসিয়া পাতের চারিদিকের পাহাড়টা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া ধোঁকার জন্য আর একটু জায়গা করিয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ এক হাতার বেশি দিও না কিন্তু। খাওয়া এদানি ছেড়েই দিয়েছি। নেহাৎ ধোঁকাটা একটু উৎরে গেছে, তাই..."

তরকারি-পর্ব শেষ হইল—খান পাঁচেক বেগুন ভাজা, একটু নিরামিষ ডাল আর সামান্য দগ্ধ কপির ডালনা।

আর হ্যাঁ, শেষে একটু চাটনি জুটিয়াছিল। মধুকাকা বলিলেন, "না, শৈলেনবাবু, এতে আপত্তি করলে শুনব না; গুরুতর আহারের পর চাটনি একটু খেতেই হবে। আচ্ছা বেশি দেবে না, আমি দেখছি...।"

মরিয়া হইয়া বোধ হয় এক্ষেত্রে মনের ভাবটা চাপিতে পারিতাম না; কিন্তু অম্ললুব্ধ রসনা বড় বেশি সজল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বাক্য নিঃসৃত করা গেল না। মধুকাকার নিম্নমুখী সতর্ক দৃষ্টির সামনে পিতলের চামচের একপ্রান্ত থেকে অল্প একটু রসের সঙ্গে দুইটি আলুবোখরা আর গুটি ছয়-সাতেক কিসমিস নিতান্ত অপরাধীর মত শূন্যপ্রায় পাতের উপর আসিয়া পড়িল।

হলধরবাবু উপরে আসিলেন। চারিদিকে দেখিতে শুনিতে আমার পাতের সামনে আসিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কি শৈলেনবাবুর পাতে যে কিছুই ...!"

মধুকাকা হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "স—ব ঠিক আছে, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি পুরো চার্জ নিয়ে বসে আছি.. উনি যা খান তা যথাস্থানেই পেঁছেবে, পাতে তুমি আর দেখবে কোথায়!"

বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া নিজের রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহার পর হলধরবাবুর পিঠে গোটাকতক চাপড় দিয়া বলিলেন, "তুমি বরং নিচের দিকটা সামলাও—আমি যেতে পারছি না; ছেড়ে নড়বার জো নেই, সব মাটি করে বসবে... বসেইছিল সব মাটি করে..."

নিচে থেকে আওয়াজ আসিল, "তাহ'লে আমি নিশ্চিন্দি, কাকা রইলেন শৈলেনবাবু, যেন কোন..."

বলিলাম, "বিলক্ষণ!"

মধুকাকা বলিলেন, "কিছু ভাবতে হবে না; তুমি বরং একছিলিম তামাক সেজে পাঠিয়ে দাও...এখানে সব নির্ভুল চলবে,—আজকের পরিচয়!—নাড়িনক্ষত্র জানা আছে যে..."

দই আসিল। মধুকাকা তখন হুঁকায় নূতন সাজা কলকে বসাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, ডাইনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলিতেছেন,—তরকারির ফাঁড়া গেল এখন মিষ্টান্নের আক্রমণ হইতে কোন প্রকারে আমায় যেন রক্ষা করিতেই হইবে।

"হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ! না; দই নয়—ন রাত্রৌ দধি-ভক্ষণম্—দেখলে কত সাধ্যিসাধনা করে, অনেক কষ্টে একটু চাটনি নিতে রাজি করালাম আর

তুমি কি না সেই লোকের পাতে দই দিতে চলেছ!...তোমার হাতে ও কি?—বোঁদে? না, চলবে না।"

ছোকরা বলিল, "খুব খাস্তা বোঁদে হয়েছে, দিই না একটু..."

মধুকাকা বিরক্ত হইলেন, "আমায় যদি ওঁর খাওয়া সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ মনে কর তোমরাই ওঁকে বল—রাজি কর। তবে হলধরের কাছে আমার কোন জবাবদিহি রইল না।"

—বলিয়া মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া সঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

বলিলাম, "না,—খালি বোঁদে কি চলে? ওটা দইয়েরই একটা অঙ্গ কি না..."

কথাটার দুইটা মানেই হয়, আমার অদৃষ্টে সোজা মানেটাই খাটিল। মধুকাকা বিজয়ের উৎফুল্লতায় মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "হ'ল তো? তোমরাই না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ, বলে দই-ই নিলেন না তো বোঁদে! আরে দই ছাড়া বোঁদে সে তো হল যেমন..."

তর্কবিতর্কেই অমূল্য সময়টা কাটিয়া যায় দেখিয়া বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে তাগাদা দিলেন, "এই ছেলেটির পাতে একটু বোঁদে।"

দেখিলাম ছেলেটির দরকার নাই, তাঁহার নিজেরই পাত শূন্য।

মধুকাকা বলিলেন, "যাও, সন্দেশটা পাঠিয়ে দাও।"

বোঁদের পরিবেশক ঘুরিয়া বলিল, "সন্দেশ হয় নি তো, রসগোল্লা আর লেডিগেনি হয়েছে, নিয়ে আসছে।"

মধুকাকা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "অ্যাঁ, শৈলেনবাবুকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে আর সন্দেশ করা হয় নি! হলধর এ করলে কি! আমি যার ভরসায় রয়েছি—জিনিসটা ওঁর বরাবরই প্রিয়—জবরদস্তি গোটাকতক নেয়াবই—আর তুমি বললে কি না—সন্দেশের পাটই নেই।"

সন্দেশ জিনিসটাকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। ও ছানার-ছাতু আমার গলা দিয়া কখনও নামে না, তাহার উপর কান্না ঠেলিয়া গলা আজ যেন একেবারে কাঠ হইয়া আছে।

মধুকাকা একেবারে মুশড়াইয়া গেলেন। রসগোল্লা আর লেডিগেনি আসিলে হতাশভাবে বলিলেন, "আরে ও কি খান কখনও শৈলেনবাবু যে বলব খেতে ওঁকে?"

খাইতে বলিলেনও না, তবে অবশ্য বারণও করিলেন না. কেমন যেন একটা হাল ছাড়িয়া দেওয়া ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

আমি রসগোল্লাটা বাসি ভাল. পানতুয়া বা লেডিগেনিটা ততোধিক। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া একটাও লইতে পারিলাম না।

তাহার কারণ. মধুকাকা দেখিলাম একেবারে দমিয়া গিয়াছেন, এর উপর যদি, যে রসগোল্লা-লেডিগেনি তাঁহার মতে আমার অভক্ষ্য, তাহারই দুই-চারিটা খাইয়া ফেলি তো ব্যাপারটা বড়ই মর্মন্তুদ হইয়া পড়িবে। আর মধুকাকার মতে যে-জিনিসটা ভালবাসি না, লোভের বশে সেইটাই আহার করিয়া ফেলিলে মুখ দেখাইব বা কেমন করিয়া লোকসমাজে?

যে ছেলেটি পরিবেশন করিতেছিল তাহাকে বলিলাম, "না আর দরকার নেই, খাওয়াটা চাপ হয়ে গেছে।"

শেষের কথাটুকু ব্যঙ্গ—শেষে ঐটুকুতেই যৎসামান্য সান্ত্বনার চেষ্টা করা গেল। হায়, কেই বা বুঝে ব্যঙ্গ!—তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাওয়ায় মধুকাকা আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখলে তো? আসল কথা ও-দুটো জিনিস ওঁর রোচে না—কোন কালেই রোচে নি। তোমরা না হয় শৈলেনবাবুকে আজ দেখছ; কিন্তু আমার তো আজকের পরিচয় নয়, শৈলেনবাবু কি খান না খান আমার কাছে লিখিয়ে টিপসই করে নাও; অক্ষরে অক্ষরে না মেলে, যা চাও জরিমানা দিচ্ছি, হুঁ...কি হে ছোকরা, পান দিচ্ছ? ..না, শৈলেনবাবু পান খান না।... সুপুরি লবঙ্গ দিয়ে একটু মসলা করে নিয়ে আসবে শৈলেনবাবু? না, তাও ছেড়ে দিয়েছেন এদানি?"

নিমন্ত্রিতেরা সব উঠিয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ বাঁ-হাতটি মাটিতে চাপিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। চারিদিকে রন্ধনের প্রশংসা এবং তৃপ্ত উদ্গারের মধ্যে আমার তখন চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিলাম, "না, আজকাল হর্তুকিই খাই একটু খেয়ে উঠে: তা সে পকেটেই আছে, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।"

একটা মস্তবড় কাজ অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সামলাইয়া লইবার আনন্দে মধুকাকা মৃদু হাস্যের সহিত ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।

মাথা না থাকিলেও...

রাসুদা' অত্যন্ত চটিয়াছে।

রাগটা সন্ধ্যা হইতেই ধুমাইতেছিল, বহিরূপে জ্বলিয়া উঠিল আহারের সময় এবং পাচক-ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া।

আসনে বসিয়াই রাসুদা' প্রথমে গেলাসটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরীক্ষা করিল। নূতন চাকরটার কাজ খুব পরিষ্কার, নিখুঁতভাবে মাজা গেলাসের বাহিরে ভিতরে ঘরের বিদ্যুতের আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; একটু নিরাশভাবে রাসুদা' গেলাসটা নামাইয়া রাখিল। তাহার পর থালার উপর বেশ ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—"বলি, একি হয়েছে ঠাকুর?"

আর সবাই একবার আড়চোখে রাসুদা'র পাতের দিকে চাহিল। ঠাকুর একটু শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করিল, "কি বড়বাবু?"

"তাও বলে দিতে হবে?...থাক্, কিছু নয়, বড় চমৎকার হয়েছে। এর চেয়ে বেশি আশা করাই অন্যায় আমার।"

সকলে আর একবার আড়চোখে থালার পানে চাহিল, কয়েকজন পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল, একটু ইসারার বিনিময়ও হইল,—অর্থাৎ, আর দেরি নাই। ঝড় উঠিল বলিয়া।

একটা অস্বস্তিকর মৌনতা ঘরটায় থমথম করিতেছে। সকলেরই মনে হইতেছে—রাসুদা' যখন নিজে কিছু বলিতেছে না তখন যে-ত্রুটিটুকু হইয়াছে সে-সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজনের ঠাকুরকে তিরস্কার করা উচিত। কিন্তু কি ত্রুটি হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা কাহারও নজরে না পড়ায় সে কর্তব্যটুকু করা হইতেছে না। শুধু কর্তব্যই তো নয়; রাসুদা'র মন পাইবারও এই একটি সুযোগ। এদের সকলের একটি ভুলে রাসুদা' বাড়ি থেকে আসিয়া অবধি সেই যে বিমুখ হইয়া বসিয়াছে; কোন উপায়েই লাগসই হইতেছে না।

অবশেষে নৃপেন একটু বুদ্ধি খাটাইল। ত্রুটি সম্বন্ধে কোন উল্লেখই

না করিয়া বলিল ,"সত্যিই, এ তোমার ভয়ংকর বেয়াক্কেলেপনা হয়েছে তো ঠাকুর। লোকে..."

আর অগ্রসর হইতে হইল না। রাসুদা' ঠাকুরকে ছাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে নৃপেনকে লইয়া পড়িল, অর্থাৎ নৃপেনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মেসটাকে। ভাতের গ্রাস ছাড়িয়া আঙুল কয়টা থালে চাপিয়া বলিল, "বেয়াক্কেলেপনা করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে শুনি? কি রকম জায়গায়, কি রকম লোকদের নিয়ে কাজ করছে ও? সমস্ত মে'টাতে ক'টা লোকের আক্কেল আছে শুনি, যে ও গরীব বেচারার থাকবে? পরকে বলতে কিছু লাগে না; কিন্তু এতগুলো লোক তো আছে মেসে?—কেউ বুকে হাত দিয়ে বলুক তো যে কোন ভদ্দরলোক এলে-গেলে একটা শুকনো সামাজিক জিজ্ঞাসাবাদ করবারও শিক্ষা আছে কারুর... আবার হাসা হচ্ছে মিটি মিটি..."

অমল বলিল, "আমি কিন্তু তখন ছিলাম না ওদের মধ্যে রাসুদা', ঠাকুরকে জিগ্যেস করতে পার, আমি তখন অন্য এক ফ্যাসাদ নিয়ে পড়েছি—রান্নাঘরে বসে মাংসের নুনঝাল চেকে দিচ্ছি ঠাকুরকে।"

রাসুদা' ভাত-ডালের একটা ক্রুদ্ধগ্রাস তুলিতে যাইতেছিল, হাতটা আবার নামাইয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "নাও, খুব দরদ দেখান হয়েছে। সব মেয়াকেই চেনা গেল।... জোর গলা করে যে বলতে এসেছ, মাংসটাই তোমার বড় হল? আর এদিকে যে একটা লোক সেই ধাধ্ধাড়া-গোবিন্দপুর থেকে গায়ের আদ্দেকটা রক্ত মার্টিন কোম্পানীর ছারপোকাদের বিলি করে আধ-মরা হয়ে মেসে এসে উঠল, কোন্ এসে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারলে যে রাসুদা', বেঁচে ছিলে, কি মরেছিলে? কি, বাড়িতে গিয়ে কাউকে জ্যান্ত দেখেছিলে, কি ধুঁকছে? কি... থাক্ না ভাই, দুনিয়ায় কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ? তবে এ মেসে আর নয়, ঢের শিক্ষে হয়েছে।...আজ রাত্তিরে আর কোন্ আঘাটায় গিয়ে উঠব? কিন্তু ঠাকুর, কাল সক্কালেই দুটো রিক্‌শ এনে হাজির করবে; আমার বিছানা, বাক্‌স যা কিছু আছে সব নামিয়ে দেবে।... (আড়চোখে একবার সবার দিকে চাহিয়া) বৌ একটা তিজেলের মধ্যে কি ছাইপাঁশ বেঁধে দিয়েছে সেটি সুদ্দু যাবে—বুঝলে?... হ্যাঁ, যাবে। হাঁড়ির মুখের শাল পাতাও যেন এক টুকরো না পড়ে থাকে। পনের বছরের মেস—মায়ায় পড়ে আছি—কিন্তু কিসের মায়াটা শুনি?—আর মায়াটা

একতরফা জিনিস, না? ... কাল ঠিক ভোর চারটেয় রিক্‌শ এসে হাজির হওয়া চাই।"

গোড়ার ইতিহাস একটু বলা দরকার, তাহা সংক্ষেপত এই—

রাস্‌দা'র সপ্তাহান্তিক রুটিন হইতেছে—শনিবার আড়াইটের ট্রেনে পাড়ি দেওয়া, আবার সোমবার বাড়ি ফেরৎ একেবারে আফিস সারিয়া—সন্ধ্যার সময় ঠুক্ ঠুক্ করিয়া মেসে আসিয়া প্রবেশ। ক্বচিৎ এক-আধটা শনিবার বাদও যায়, তেমনি আবার কখন কখন সোমবারের ডিউটি বিষয়ে আফিসে কিছু আপোস-বন্দোবস্ত করিতে পারিলেও নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়,—রাস্‌দা' সন্ধ্যা ছ'টা-বাহান্নর গাড়িতে নামিয়া একেবারে মেসে আসিয়া ওঠে। সোমবারের বন্দোবস্ত যাহার সহিত হইয়াছিল মঙ্গলবার সকালে গিয়া তাহার কাজ চালাইয়া দেয়।

এই সোমবারের সন্ধ্যাগুলির দিকে মেসের জীবগুলি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া যে-সোমবারে রাস্‌দা' বাড়ি থেকে সোজা আসিয়া মেসে নামে। সাতকড়ি তাহার আফিসে কাজ করে; পাঁচটার সময় আফিসফেরৎ আসিয়া খবর দেয়, "ওহে, আজ রাস্‌দা' কাজে আসেনি; শুনে রাখো সব।' নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ না থাকিলে আর কেহ বাহির হয় না।

দাদা আসিয়া তালাটি খুলিয়া ঘরে ঢুকিল, জিনিসপত্র রাখিয়া, দরজার কাছে আসিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া ডাকিল, "কেষ্টা!—কেষ্টা কোথায় গেলিরে? দিয়ে যা বাবা একছিলিম সেজে।"

ওদিক থেকে বোধ হয় ব্রজেশ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাহির হইয়া আসিল।—"রাস্‌দা" যে! কখন এলে? বাড়ির খবর সব ভাল তো? বৌদির কোমরের সেই যে ব্যথার কথাটা বলেছিলে সেবার?"

রাস্‌দা'র মুখটা প্রসন্ন হইয়া ওঠে, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব স্বরটা করুণ করিয়া বলেন, "আছে একরকম। ও আর সেরেছে রে ভাই, তুমিও যেমন। আমাদের কি আর সারবার বয়েস আছে?—গায়ের রোগ সয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা। তারপর,—বাড়ির চিঠিপত্র পেয়েছ তো ব্রজেশ?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া—অনাথ হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"রাস্‌দা' নাকি?"

সে যেভাবে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হন্তদন্ত হইয়া নামিতে

যাইতেছিল, মনে হয় নিচে কোথাও নিশ্চয় একটা বিশেষ কাজ আছে। কিন্তু গেল না, ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "আমি ভাবলাম আজ বুঝি আর এলে না। তাই বলছিলাম ব্রজেশকে তখন, বৌদির ব্যথাটার কথা রাসুদা' বলছিলেন—কেমন আছেন কে জানে।... আছেন কেমন বলত রাসুদা'? ... কেষ্টা কোথায় গেল? তামাক দিক না ... কেষ্টা! — এই-এক হারামজাদা, কুঁড়ের বাদশা জুটেছে!"

দাদা বলিল, "আসছে কিনা! বেরিয়েছে বোধ হয় কোন কাজে। বৌয়ের কথা আর জিগ্যেস করে কাজ নেই। এই যে বলছিলাম ব্রজেশকে..."

নিচের তলায় সিঁড়ির পাশের ঘর থেকে হারু-লাট মেজাজের উপর বাহির হইয়া আসিল,—মেজাজের জন্যই তাহার 'লাট' আখ্যা,—প্রশ্ন করিল— "কেন কেষ্টাকে? একসঙ্গে ক'টা দিক দেখবে শুনি?—কেষ্টা তো দশভুজা নয়।—আমার ঘরে একটু ..."

হঠাৎ দাদার দিকে নজর পড়িতেই—"রাসুদা' তুমি? এক্‌স্‌কিউজ্‌ মি, আমি মনে করি ..."

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে আসিতে—"আগে বৌদিদির খবর বল: স্টিল্‌ ডাউন্‌, না, সেরে উঠেছেন? ... কেষ্টা! - ও ছেড়ে দে এখন, শীগ্‌গির এসে তামাক দে আগে রাসুদা'কে ..."

নিচে কেহ বোধ হয় কোথাও বাহির হইতে আসিয়া এইমাত্র মেসে প্রবেশ করিল; অনির্দিষ্টভাবে উদ্বেগপূর্ণ প্রশ্ন—"হ্যাঁ হে, রাসুদা' এল কি না তোমরা কেউ জান? ... আসতে পারলে না? বৌদি আবার পালটে পড়ল কিনা কে জানে। মনটা এমন খারাপ হয়ে ..."

ওপরে দৃষ্টি পড়িয়া যাইতেই—"কি?—ছ'টা-বাহান্নয় বুঝি রাসুদা'? বাড়ির খবর বল আগে ..."

—সমস্ত সাজান, এমন কি কেষ্টা আসিয়া হুঁকাটি হাতে দিয়া 'মা-ঠাকরুণ'-এর কুশল প্রশ্ন করিবে—সেটি পর্যন্ত। রাসুদা' হুঁকাটা লইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিবে, "কাটাচ্ছে একরকম কেঁদে কোকিয়ে। তুই এক কাজ কর দিকিন—মুখে ন্যাকড়া-বাঁধা ঐ তিজেলটা বের কর্‌; আসবার সময় কি কতকগুলো দিলে ঘাড়ে চাপিয়ে ..."

কয়েকজন একটু নাকি সুরে একসঙ্গে অনুযোগ করিয়া উঠিল, "আবার

সেই তো?—নাঃ, এ বড় অন্যায় বৌদি'র—একলা মানুষ, তায় ঐ কোমরে ব্যথা, তার ওপর দাঁত কনকনানি—এ-সব তো কায়েমী, তার ওপর এটা ওটা সেটা তো লেগেই রয়েছে। এ-সব হাংগামা করতে যাওয়া কেন বলত?—তুমিও বোধ হয় মানা কর না রাসুদা'। ভারি অন্যায়। আরে দেওর বলে মনে রাখেন এই তো যথেষ্ট; বলে, আজকাল নিজের ভাজই বড় ফিরে দেখছে ... নাঃ।"

রাসুদা' হুস্বটানে ঘন ঘন তামাক টানিতে টানিতে হাসিয়া বলে, "মানা কি শোনে রে দাদা? মেয়েছেলের মন,—তোমরা ওসব বুঝবে না। ওর মনটা—কি যে বলে ভাল—আরও ইয়ে কিনা।...এবার গিয়ে দেখি বিছানা নিয়ে পড়ে রয়েছে। ঝি পাট-ঝাট সেরে চলে গেছে। মাসীমা গেছে চণ্ডী-তলায় কথকতা শুনতে। মাসীমার ছেলে হরা—রকে বসে মুড়ি, দুধ-কলা আর কতকগুলো বাতাসা নিয়ে ফলার চটকাচ্ছিল--সব খবর দিলে।

"ভেতরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম---'পড়েছ তো উল্টে আবার? .. বাথগেটের ওখান থেকে যে ওষুদটা এনে দিলাম খাওনি নিশ্চয়।'

"আস্তে আস্তে উঠে বসল। ... 'আজ হঠাৎ এলে যে? চিঠি লিখলে এ হপ্তায় আসতে পারবে না?'

"কথাটা এড়াতে চায় আর কি। বললাম—'এসে আর কি অপরাধ করেছি। বলি, ওষুদটা তুমি খেয়েছিলে?—দেখি শিশিটা।'

"ঝেঁঝে উঠল,—বলে 'জ্বালিও না বলছি, কি হয়েছে যে খামকা বসে বসে ওষুদ গিলতে হবে? পয়সা কামড়াচ্ছে, মানা করলেও আনবে ওষুদ শিশি-শিশি,—আনো।...কিন্তু হয়েছে কি আমার শুনি?'

"যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টায় মুখ সিঁটকে রয়েছে, মাঝে মাঝে বোধ হয় খুঁড়িয়েও ফেলছে—কিন্তু সেই দারুণ কোমরের ব্যথা নিয়ে একা মানুষ রাজ্যের পাট আরম্ভ করে দিলে,—গাড়ু মেজে, জল-গামছা জুগিয়ে দেওয়া থেকে, কয়লা ভেঙ্গে উনুন ধরান, কুট্‌না কোটা, বাট্‌না বাটা, জল তুলে আনা, রান্না সারা—একটি আইটেম বাদ গেল না। আর রান্নাও কি এক-রকম?—শাকভাজা থেকে নিয়ে অম্বল পর্যন্ত যতগুলি হতে পারে।... বুঝছি শরীর বইছে না, কিন্তু বাইরে জানতে দেবে? রামঃ। বরং যদি বললাম—'ওগো, কাজ কি অত হ্যাংগামে?—দুটো ভাতেভাত চড়িয়ে দিলেই

তো হয়'—সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁক করে উঠবে, বলে—'আর জ্বালিও না, একে নিজের জ্বালায় মরছি ক'দিন থেকে; তেতে পুড়ে এসে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি

'মানা কি শোনে রে দাদা?—মেয়েছেলের মন...'

লোপ পেয়েছে।—একটা মানুষ এসেছে, দুটো রেঁধে-বেড়ে দিতে হবে না! অত যদি দরদ তো না এলেই পারতে।'...রাত এগারটা পর্যন্ত অসুরের

খাটুনি খেটে সামনে পাখা-হাতে বসে একটি একটি করে খাইয়ে, ডিবে ভরে' পান সেজে রেখে বিছানা নিলে..."

বিস্মিত প্রশ্ন হইল—"নিজে খেলেন না?"

"রামঃ, খাবে কে?—তখন মড়া একেবারে। হিন্দুর মেয়ে, নেহাৎ সোয়ামীর পাতে একবার বসা চাই, হয়ত একটা মাছ খুঁটে একবার মুখে দিলে, ঐ পর্যন্ত। আবার ভক্তিটুকুও আছে কিনা।"

সদ্য-বিরহিত সেবার স্মৃতিটুকু রাসুদা' সমস্ত প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে থাকে—স্মিতবদনে, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত করিয়া, হুঁকায় খুব দরদ-ভরা হাল্কা টান দিতে দিতে। একটু পরে যেন জাগিয়া উঠিয়া বলে—"তারপর দিন সমস্ত দিন ঐ কাণ্ড—কোথায় ভাল মাছ রে, কোথায় দুধ রে, কোথায় দই রে; চালদাটা ভালবাসি জানে, ভোরে উঠে হরাকে কোশখানেক দূরে মেছেদ'র হাট থেকে চালদা আনতে পাঠিয়ে দিয়েছে।... রাত চারটে থেকে সব ব্যাপার চলবে, রবিবারের বাজার, গড়িমসি করে আটটা-সাড়ে-আটটার সময় উঠে দেখি বাড়িতে যেন যগ্যি লেগে গেছে! দেখলে একবার ভাবতে পারবে না এই মানুষ কাল সারা রাত বিছানায় পড়ে গোঙিয়েছে আর কিছু একটা কথা বলতে গেলেই থ্যাঁক্ থ্যাঁক্ করে উঠেছে। আবার মজা এই, ঝিকে কুটোটি নাড়তে দেবে না, বলে—'থাক্ বাপু, আমি সব সেরে নিচ্ছি মরতে মরতে; মানুষটিকে তো চিনিস না তোরা, এক্ষুনি বলবে—'একটা দিন এলাম তা আদ্যেক কাজ তো ঝিকে দিয়েই করিয়ে নিলে'—সারাটি জীবন বসে বসে খোঁটা দেবে, কাজ কি? কোমরই না হয় গেছে, মরিনি তো!'.. ঐ যে বলেছে—সোয়ামীর সেবায় কাউকে ভাগ বসাতে দিও না—আর রক্ষে আছে?"

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অনুযোগ হয়—"তা নয় হোল রাসুদা'—সতী-সাধ্বী মানুষ বৌদি, তায় তোমার মত শিবতুল্য সোয়ামী পেয়েছেন করবেনই; কিন্তু এই এতর ওপর আবার আমাদের জন্যে এই এক হাঁড়ি নাড়ু গড়া তো বসে বসে? কখনও গলা দিয়ে গলে আমাদের এ? না শোনেন, ধমক দিতে হয়; তুমিও বৌদিদির কাছে একটু বেশি রকম উইক্ দাদা, তা হক্ কথা বলতে হবে বৈকি।"

রাসুদা' প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলেন—"উইক্ নয়রে ভাই, ওটা

ওদেরই মস্ত বড় একটা উইক্‌নেস্—এসব খবর তো তোদের এখনও অজ্ঞাতই রয়েছে কিনা। যদি বললাম—'থাক্ না হয়, আমি ওদের জন্যে বাজার থেকে ভাল দেখে কিছু কিনে নিয়ে যাব'খন'—

"বলবে—'আহা, কালেভদ্রে বাড়ির মুখ দেখতে পায়, মা-ভাজ-বোনের হাতের জিনিস কি তা ভুলেই যায় সব, দিই না দুটো করে যা' হ'ক। এইতেই মরে যাব? ... তা নয়, আসলে তুমি এতটা পথ বইতে চাও না বোঝাটা' ... কাজেই আমার আর 'না' বলবার উপায় থাকে না। আর সত্যিই তো ভাই,—বাসায় পা দিয়েছি কি না দিয়েছি—তোমরা সব কাজ ছেড়ে—'বৌদি কেমন আছে? বৌদি কেমন আছে?'—বলে এসে জুটবে—প্রাণের টানেই তো? একটু করেই যদি কষ্ট করে ..."

শুধু এইটুকু অভিনয়, অর্থাৎ রাসুদা' আসা মাত্রই একবারটি ঈষৎ আকুলকণ্ঠে খোঁজ লওয়া—বৌদিদি কেমন আছে। তাহার পর থিয়েটার-সিনেমায় যাও, ম্যাচ্ দেখ, রেস্তরাঁয় ঢুকিয়া চপ্-কাটলেটের শ্রাদ্ধ কর একটি পয়সা নিজের গাঁট থেকে বাহির করিতে হইবে না, গৌরী সেন আছে রাসুদাদা। এ শুধু আজকের ইতিহাস নয়, যতদিন থেকে আছে রাসুদা' মেসে এই কাণ্ড চলিতেছে। আয়ের অর্ধেকটা বোধ হয় এই দিকে যায়।

আজ কিন্তু এরা সব ঠিকে ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।

রাসুদা' আসিয়া দেখিল মেস নিঃশব্দ, শুধু রান্নাঘর থেকে ঠাকুরের খুন্তিনাড়ার শব্দ আসিতেছে।

রাসুদা' হাত-পা ধুইয়া নিজের হাতেই তামাক সাজিল। দুই তিনবার ক্রমোচ্চ পর্দায় গলা-খাঁখারি দিল, কোন রকম সাড়া না পাইয়া বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া আড়-চোখে একবার সব ঘরগুলা দেখিয়া লইল, তাহার পর সিঁড়ির মাথায় নিজের ঘরটির সামনে দাঁড়াইয়া হুঁকায় দুইটি টান দিয়াছে এমন সময় নিচে, মেসের সমনে একটা গগনভেদী কলরব উঠিল ও সঙ্গেসঙ্গে প্রায় দশ-বার জন ছোকরা হুড়মুড় করিয়া একসঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল। আগে নজর পড়িল ব্রজেশের; "রাসুদা' এসেছে—হুর্‌রা!!" বলিয়া একটা আওয়াজ করিতে করিতে সমস্ত দলটা ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিয়া মুহূর্তের মধ্যে রাসু-দাদাকে ঘিরিয়া ফেলিল, তাহার পর একেবারে সপ্তম পর্দায় একটা মেস-ফাটান

চীৎকার—"মোহনবাগান! চ্যাম্পিয়ান!—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালে দাদা!—হুর্‌রা!!—খাওয়াও দাদা—গোটা দুই ম্যাচ বাকি, কিন্তু আর রোখে কে?—থ্রি চীয়ার্স ফর্...."

হঠাৎ সমস্ত আওয়াজটা মাঝ পথে থামিয়া গেল। দাদা নির্বিকার; অবিচলিতভাবে ঘুরিয়া হুঁকাটা চৌকাঠে ঠেস দিয়া রাখিয়া শ্রান্তকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিল, "আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কি হবে বল ভাই—বলে নিজের হ্যাপা সামলাতেই বাজিভোর... তা মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হোল কি কে চ্যাম্পিয়ন হোল..."

সকলে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়া গেল। নৃপেন ঠেলিয়া দলের সামনে আসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল--"মোহনবাগান তো পরে,—আসল কথাই তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি তোমায়,--ইয়ে—বৌদির সেই ব্যথাটা—আছেন কেমন বৌদি রাসুদা'?"

দীর্ঘশ্বাস টানিয়া রাসুদা' তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "ছেড়ে দাও সেটার কথা—আজ কাটে তো কাল কাটে না--কে তার কথা ভাবে?... মোহনবাগান তো নিলে লীগ, তাহ'লেই হোল..."

আবার মিশ্রিত কণ্ঠের একটা ত্রস্ত কলরব উঠিল, "কাটে-না কি দাদা!.. ভাবিয়ে তুললে যে!...একে বাঁ চোখটা নাচছে আমার--ছুটি নিলেই পারতেন দুটো দিন..."

কিন্তু কোন ফল হইল না। রাসুদা' আরও ক্লান্তস্বরে বলিল, "তোমরা মোহনবাগান নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করগে, আমায় একটু ছেড়ে দাও ভাই, সমস্ত রাত কানের কাছে রুগীর কাৎরানি শুনতে শুনতে, আর..."

বলিতে বলিতে গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভিতর হইতে হাঁড়ির মুখের ঢাকা ভেদ করিয়া বৌদি'র তৈয়ারি মুকুন্দ-মোয়ার মিষ্ট মাদক গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। সকলে ঘ্রাণের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য তৃপ্তি সংগ্রহ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। নিচে গিয়া এই নিদারুণ ভুলটার জন্য চাপা গলায় পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া যতটুকু সান্ত্বনা আহরণ করিতে পারে তাহারই প্রয়াস করিতে লাগিল।

মোহনবাগান জমিল না। ভোজন পর্বের ইতিহাস বলাই হইয়াছে।

এখন মাত্র একটু ক্ষীণ আশা রহিল গোপেনকে লইয়া। সে তিন দিন হইল বাড়ি গিয়াছে। সুতরাং মোহনবাগান লইয়া এ বিড়ম্বনার বাহিরে এখনও সে যদি তালটা সামলাইয়া লইতে পারে। সুধু সুরেভি মুকুন্দ-মোয়াই নয় তো মোহনবাগান লইয়া ফীস্ট (feast) সিনেমা অত ভক্ত মোহনবাগানের দাদা- কত বড় একটা আশা সবাইয়ের সবাই অনুশোচনায় নিজের নিজের হাত কামড়াইতেছে কি সর্বনাশটাই যে হইল সুধু এক মুহূর্তের ভুলে!

পাছে গোপেন আসিয়াও কাঁচাইয়া বসে সেই ভয়ে রাত সাড়ে-দশটা পর্যন্ত অর্থাৎ বাসুদাদা যতক্ষণ জাগিয়াছিল- কয়েকজন পালা করিয়া মেসের দরজার কাছে পাহারা দিতে লাগিল। গোপেন কিন্তু সে রাত্রে আসিল না।

পরের দিন গোপেন সকাল প্রায় আটটার সময় আসিল। নীচের খবর পাইয়াছে কাল থেকে রুদ্ধ উল্লাসে সমস্ত বুকটা যেন বারুদ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে দরজায় পা দিয়া এদের কয়েকজনকে দেখিয়া একটা উৎকট চীৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল ব্রজেশ তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল।

তাহার পর দরজার কাছেই আড়ালে দাঁড়াইয়া আদ্যন্ত সব কথা শোনাইয়া গেল। হরেন বলিল বৌদি'র হাতের এক তিজেল মুকুন্দ মোয়া গোপেনবাবু শক্তিশেলের মত কী গন্ধটাই বিলুচ্ছে কাল থেকে!

গোপেনের মুখটা হঠাৎ একটু যেন কি রকম হইয়া গেল একটু নিষ্প্রভ হাসি হাসিয়া বলিল আর বৌদিদির হাতের!

সকলে উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল মানে কোন দুঃসংবাদ নাকি

একটু বলিয়া বাঁ হাত দিয়া তাহাদের আপাতত আর প্রশ্ন করিতে মানা করিয়া এবং সেইখানেই থাকিতে ইসারা করিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ডাকিল কই হে সব কোথায় গেলে কেষ্টা!

কেষ্টা উত্তর দিল।

বাসুদা এসেছে

কেষ্টা এবং কয়েকটি ঘর হইতে আরও কয়েকজন জানাইল বাসুদাদ আসিয়াছে কাল রাত্রে।

এসেছে! আমি ভাবতে ভাবতে আসছি বোধ হয় আসতে পারবে না বৌদি র অসুখটা যে রকম খারাপ বলে গিয়েছিল বলিতে বলিতেই

সিঁড়ির দিকে ব্যস্ত আগ্রহে অগ্রসর হইতেছিল, রাসুদাদা হুঁকা হাতে সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল।

"কে, গোপেন এলে নাকি? বাড়ির খবর ভাল?"

উঠিতে উঠিতে গোপেন উত্তর করিল—"আগে বৌদি'র খবর বল শুনি দাদা, তিনটে দিন যে কি করে কেটেছে!"

তৃপ্তভাবে হুঁকার ধোঁয়া ছাড়িয়া রাসুদাদা বলিল, "আছে বেঁচে, তুমিও যেমন রে ভাই। আর কি সারবে?"

"না কমে থাকে, বাড়ে নি তো?"

"বেড়েছেও বলতে পার, কমেছেও বলতে পার; মানে তোমাদের বৌদি যা মানুষ—মুখ থেকে আসল কথা তো বের করতে পারবে না। গেল তোমাদের দাদা,—সেই কোমর, সেই দাঁত নিয়ে চরকি ঘুরছে—কোথায় ভাল মাছটা রে, কোথায় চালদা রে, কোথায়...মরুক গে, হ্যাঁ, আসল কথাই তো হল না—খবর শুনেছ তো? আমাদের মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপ—যা খেলেছিল এবারে...!"

গোপেন একটু বিরক্তভাবে দক্ষিণ হাতের চেটোটা উঁচাইয়া বলিল, "তুমি একটু ক্ষ্যামা দাও দাদা,—মোহনবাগান!—আমি মরছি বৌদির খবরের জন্যে, তোমার মন পড়ে রয়েছে বাজে একটা—"

হুঁকার ধোঁয়ার সঙ্গে অমায়িক হাসির সংমিশ্রণে কাসিতে কাসিতে দাদা বলিল,—"না-রে দাদা, বাজে খবর নয়, তোমরা অবশ্য বৌদি বৌদি করেই পাগল, কিন্তু...ভাল কথা...ইয়ে—কেষ্টা!...তোকে যে বললাম কাল মোয়ার তিজেলটা ওদের বের করে দিতে...কি বলছিস?—বলিনি!...তা হবে, যা মনটা খারাপ হয়ে আছে বাড়িতে ওদের ওরকম দেখে এসে!..এখন গন্ধ নাকে আসতে মনে পড়ল।...আয় দিকিন...তুমিই না হয় নিয়ে যাও না, গোপেন—ভারি তো গোটাকতক খইচুর—মুকুন্দ মোয়া..."

*

*　　*

নিচে, একেবারে ওদিককার ঘরটায় মুকুন্দ-মোয়ার সদ্গতি হইতেছে, কেহ বিছানায়, কেহ চেয়ারে, কেহ টেবিলে, কেহ জানলার ধারটিতে, কেহ দরজায় ঠেস দিয়া। গোপেন একটু যেন অন্যমনস্ক।

অনাথ বলিল, "দেখ বেইমানি আমাদের—বৌদি'র হাতের খাচ্ছি, কিন্তু তাঁর কথাটা একেবারেই সব ভুলে গেছি!—কি দুঃসংবাদ বলছিলেন গোপেনবাবু?"

"বৌদি' নেই!"

"নেই!!"—হাতের মোয়া যার যেখানে ছিল, সেইখানেই রহিয়া গেল। গুছাইয়া প্রশ্ন করিবার সামর্থ্য না থাকায় ব্রজেশ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "নেই...কোথায় গেছে?...মানে—ইয়ে—মারা..."

গোপেন বলিল—"কোথাও ছিল না; সুতরাং কোথাও যাবার কথা ওঠে না।...জনাইয়ে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম অনেক দিন পরে। কাল বিকেলে হঠাৎ মনে হল রাসুদা'র বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছি, ওদিক হয়ে যাই দুটো স্টেশন এগিয়ে,—রাসুদা' আর-শনিবার বাড়ি আসে নি, আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত থাকবে, আমি গিয়ে পড়লেই রাত্তিরটা আটকে যাবে'খন। তারপর রাসুদা'র ওখানেই রাত কাটিয়ে দু'জনেই একসঙ্গে মেসে ফেরা যাবে কাল।—মানে টানটা আসলে ছিল বৌদি'র জন্যে—দূর থেকে নাড়ু, চন্দ্রপুলি আর মুকুন্দ-মোয়া খেয়ে একেবারে হাতের আদর-যত্ন পাওয়ার অনেক দিন থেকে একটু লোভ ছিল।

"আমার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে লেট হয়ে গেল বেশ খানিকটা, গিয়ে দেখলাম দাদা চলে এসেছে, আর..."

অতি ব্যগ্র প্রশ্ন হইল—"আর বৌদি'...?"

প্রশ্নটা যেন কানে যায় নাই এইভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়া গোপেন বলিল—"আর বৌদি' বলে কোন জিনিসই নেই—দাদা বিয়েই করে নি, বা হয় নি বিয়ে—যা বোঝ।"

"বিয়েই হয় নি!!" -বিস্মিতভাবে চেঁচাইয়া উঠিতে গিয়া সবাই অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরটা চাপিয়া লইল।

গোপেন বলিল— "না। বুড়ী মাসী আছে, মাসতুত একটি ভাই আছে, ব্যস। সমস্ত রাত স্টেশনের মশার কামড়ানি, তারপর এই ভোরেব গাড়িতে ..."

অনেকক্ষণ সবাই চুপ করিয়া রহিল, মোয়া হাতে সবাই যেন পাথরের নাড়ুগোপাল হইয়া গেছে।

একটু পরে অনাথ ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিল "অদ্ভুত!... তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মাথা না থাকলেও মাথা ব্যথা হয়!"

ব্রজেশ একটু হাসিয়া বলিল "বরং কোমর না থাকলেও কোমরের ব্যথা -বল!"

খানিকক্ষণ কেহ আর কথা কহিল না। পরে গোপেন বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল - "কিন্তু কথাটা যেন ঘূণাক্ষরেও না টের পায় রাসুদা', তাহ'লে অমন বৌদি' তো গেলই আমাদের এ রাসুদা'কেও আর পাব না কখন।"

গ্রাম-সংস্কার

বেশ কাটিতেছিল।

ইউ পি স্কুলের হেড-মাস্টার। ক্রোশ দুয়েক দূরে জগদীশপুরের এল পি স্কুল ছাড়া পাঁচ মাইলের মধ্যে মা সরস্বতীর আর বৈঠক নাই। ক'খানা গ্রামের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ শৈল ঠাকুর এই অধীন। ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ কল্পিত ভিলেজ স্কুল মাস্টারের জীয়ন্ত সংস্করণ।

একমেবাদ্বিতীয়মের আপনারা বাংলা অনুবাদ নিশ্চয় করিবেন বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। করুন আপত্তি নাই। আচ্ছা, সুখ জিনিসটা কি নিতান্ত বস্তুনিরপেক্ষ নয় মনের দিক দিয়া ধরুন, আগ্রার দেওয়ান-ই-আমে নতশীর্ষ রাজন্যবর্গের সভায় মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরসিংহাসনে উপবিষ্ট শাজাহানের বুকে যে অনুভূতি স্পন্দিত হইত আকাশের মুক্ত চন্দ্রাতপতলে কৃষ্ণশিলার নগ্ন সিংহাসনে অর্ধউলঙ্গ বন্য সামন্তদের মধ্যে উপবিষ্ট ভিলরাজার বুকেও কি ঠিক সেই অনুভূতি জাগে না?

আপনারা এর উত্তর করিতে পারিবেন না কেন না আপনারা কেহই রাজা নন। আমি পারিব কেন না আমি যে এক বন্য রাজ্যের অধীশ্বর সেই কথা বলিবাই সুরু করিয়াছি। তর্কে কিছু ভুল থাকিয়া গেল বলিতেছেন। তা থাক এই রকম তর্কেতেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে।

চলিয়া যাইতেছিল বলা উচিত কেন না সম্প্রতি আমি রাজ্যচ্যুত। এটা সেই দুঃখেরই কাহিনী বলিতে বসিয়াছি।

আমার স্কুলের সামনে দিয়া শিবডাঙা আর বক্সপটির হাটের রাস্তা এবং পিছনে আশু মোক্তারের পুকুর। যে স্কুলের সামনে দিয়া হাটের রাস্তা আর পিছনে স্নানের পুষ্করিণী সে স্কুলের একটা মস্ত বড় সুবিধা তাহাতে পড়া হয় না।

আপনাদের মধ্যে কেহ কি মাস্টার আছেন? থাকিলে, গুরুমহাশয়, স্কুল-মাস্টার, প্রফেসর, গবেষক—যে কোন স্তরেরই হোন না কেন, নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন পড়ার ঝঞ্ঝাট না হইলে আমরা কেহই ক্ষুব্ধ হই না।

ছেলেরা তো নয়ই, অনেক গার্জেনও নয়, অন্তত সেই সব গার্জেন যাহাদের কাছে ছেলেরা পড়া বলিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হয়। আমি তো ছেলে-বেলায় দেখিয়াছি, মামা পড়া না করিবার জন্য যতটা প্রহার দিতেন, পড়া করিবার জন্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে অপর কোন না কোন ছুতা করিয়া তাহার চেয়ে ঢের বেশি ঠেঙাইতেন।

পড়া বাদ দিয়া আমার স্কুলে আর সব কিছুই হইত।

পাঠশালার আটচালার মাঝের ঘরটি আমার; একটি হল গোছের। আমি রাস্তার দিকে মুখ করিয়া বসিতাম।

*

* *

দুর্লভ আসিয়া উপস্থিত হইল।

"প্রণাম ঠাকুর।"

"আরে দুর্লভ যে! খবর কি? এস, বস।"

"খবরের কথা আর জিগুবেন না। এদিনে শিবডাঙার হাটে যাওয়া হল না রাঙী-গাইটা পর্শ হল কিনা। দেখ, আসল কথা জিগুতে ভুলেই গেছলাম আর কি! রাঙী বিওল মঙ্গলবারের ঠিক সন্দের মুখে, দেবতা ঠিক পাটে বসলে আর কি; নই বাছুব, এখন শাস্ত্রে লক্ষণ কি বলেছে বলেন তো ঠাকুর!"

উৎকর্ণ ছেলেগুলার জন্য টেবিলে একটা বেত-আছড়ানি দিয়া বলিলাম

"মঙ্গলের সাঁঝে হল নই
কোথায় থুবি মাখন দই?"

খনার বচন নয়, আমার নিজের। এই ক্ষমতাটা ছিল আমার প্রতিপত্তির মূলে। দুর্লভ গদগদ হইয়া উঠিল, –"এই দেখ আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম!"

কাঁধের গামছাটা নামাইয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া, কলাপাতায় জড়ানো খানিকটা দা-কাটা তামাক হাসিতে হাসিতে সামনে রাখিয়া বলিল,

"সুখীর মা বললে, 'শোলি ঠাকুরের ওখান দিয়ে যাবে, একটু লতুন তামাক গামছায় বেঁধে দিন্।'...বনন্, তা দে।...ভুলেই গেছলাম আর কি! তা ভুলের দোষ দেওয়া যায় কি ঠাকুর? তুমিই সালিসী কর না, মাথার কি আর ঠিক আছে? রাঙী পর্শ হল, শিবডাঙার হাটে যেতে নারলাম, ভাবলাম রত্নপাটির হাটটা একবার দেখে আসি, গরুটা লতুন বিওল, এই হাটে গুড়টা কিনে থুই। আজকাল গুড় দিচ্ছে কি দর ঠাকুর?"

বাজার-রেট কণ্ঠস্থ থাকিত। বলিলাম, "সাড়ে-তের সের পর্যন্ত দেয় তো কিনে নিও, ঐ দর চলেছে ক' হাটে।"

"স'পাঁচ আনায় তা হলে কতটা হল? সুখীর মা ওর বেশি বের করলে না পয়সা, বললে, 'এ হাটে স'পাঁচ আনারই আন।' গরু আবার ভগবতী কিনা। সুখীর মা পাঁচ আনাটাকে স'পাঁচ আনা করে দিলে।"

শিরপোড়ো পটে তামাক সাজিযা আনিযা হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিল। নূতন তামাক আসিলেই সে নিজে হইতে উঠিয়াই এ কাজটুকু সারিয়া ফেলে এবং হুঁকাটা বাড়াইয়া মুখ ঘুরাইযা কোন ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে থাকে, না হইলে তাহাব নিশ্বাসের গন্ধে তামাক সাজিবার এত আগ্রহের কারণটা জাহির হইয়া পড়িবে। এই মুখ ঘোরানোটুকু আমাদের গুরুশিষ্যের মধ্যে পর্দা। এই পর্দার এধারে আমিও জানি, ও আমায় প্রসাদ না করিয়া দেয় না; ওধারে ও-ও জানে, প্রসাদের কথাটা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গুপ্ত নাই।

তামাক টানিতে টানিতে দুর্লভকে সাড়ে-তের সেরের দরে সওয়া পাঁচ আনার হিসাব করিয়া দিলাম।

"কে, দুর্লভ নাকি? তা বেশ, আমি বলি মাস্টারমশার সাথে বসে গল্প করে কে? ছেলেরা তোমার পড়ছে কেমন মাস্টারমশাই? নে, একটু সরে বস দিকিন। তামাক নিশ্চয় দুর্লভের বাড়ির? ঠিক তো? হতেই হবে, আমি যা আন্দাজ করব, তার আর নড়চড় হবার জো আছে?"

দুর্লভ কৃতকৃতার্থ হইয়া একগাল হাসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল,- "দেবতা আপনারা আজ্ঞে, আপনাদের কাছে কি চাপা থাকে কোন কথা?"

"খানিকটা দিয়ে আসিস বাড়িতে, দেখব।"

অবিনাশ ঠাকুর গ্রামের পুরুত। কৃষকপল্লীর পুরোহিত, বিশুদ্ধ এবং প্রচুর ভক্তি, দুগ্ধ ও ঘৃতের মধ্যে বেশ সুখেই থাকে; চারটি ছেলের জায়গা লইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "দাও, ধরেছে নাকি?"

কয়েকটা টান দিয়া হুঁকাটা দুর্লভের দিকে বাড়াইয়া দিল। দুর্লভ বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইল। অবিনাশ ঠাকুর বলিল, "মহাদেব মাস্টারকে দেখি না, ঐ ঘরে পড়াচ্ছে বুঝি? আজকালকার আবার পড়া! তোমাদের নিস্‌পেক্টরের নিয়ম-কানুনে আর পড়ার কি রেখেছে বল? ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাঠশালায় পা দিতেই রঘু-গুরুমশায় জিগ্যেস করলে, 'তামাকের পয়সা এনেছিস?' 'আজ্ঞে, আজ সুবিধে হল না।' 'সুবিধে হল না? বটে! আচ্ছা, বস্‌।' মাদুর বিছিয়ে বসে ধারাপাত খুলতেই—'আঠার-ঊনিশং?' ঘাগী লোক, ঠিক যেটি বলতে পারব না, সেইটি এমন তাক করে ধরত! কখনও ভুল হতে দেখি নি। তারপর উঠে মার। তার এক ঘা খেলে এদের কেউ উঠে জল খেতে পারবে? তারপর দু'হাতে ইঁট নিয়ে চেয়ার হয়ে বসা। গায়ের টাটানিতে সমস্ত দিনে একবার ভুলতে পারতাম যে সকালে পাঠশালায় গেছলাম? এরা কি পড়বে? কই, হল তোর দুর্লভ? হাটে যাচ্ছিলি বুঝি? তা যা, হাট উঠে গেলে গিয়ে আর কি হবে? তামাক যদি পেয়েছিস তো আর কিছুতেই উঠবি নি!"

দুর্লভ চলিয়া গেলে অবিনাশ ঠাকুর নামাবলীর খুঁটে বাঁধা একটা স্ট্যাম্প-মারা কাগজ খুলিয়া আমার টেবিলে বিছাইয়া দিল; বলিল, "দেখ তো মাস্টার, সুদটা দাঁড়াল কত? চক্রবৃদ্ধি হারে, সেটা মনে রেখ। তোরা সব পড় না রে বাপু, মাস্টারকে সর্বদা ছড়ি হাতে বসে থাকতে হবে নাকি? তার আর সামাজিক কাজ নেই? আরে গেল!"

ভুবন কামার উপস্থিত হইল। হাতে একখানি নূতন দা, আমার ডাক্তারির ফী।

টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া পাশে উবু হইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আছে কেমন ছেলেটি ভুবন?"

ভুবন মটকার দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা হ্যাঁ, বারো আনা আন্দাজ কমেছে বইকি।" অবিনাশ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধন্বন্তরি আর কারে কয় ঠাকুর? আমাশায় ক'দিন থেকে ভুগছিল, হাতে জল শুকোয় না, তিনটি খোরাকে বারো আনা—"

অবিনাশ ঠাকুর দা হাতে তুলিয়া লইয়া ধার পরখ করিতে করিতে বলিল, "ও বাকিটুকুও সেরে যাবে'খন; সন্দেবেলা আসিস আমার বাড়িতে, একটু রাধারমণের চন্নামৃত নিয়ে যাস। এরখানা এই রকম দা'র কথা কদ্দিন থেকে ভাবছিলাম; অনেকেই গড়ছে, কিন্তু তোর মত হাত তো হল না গাঁয়ে কারও। একথা আমি জোর গলায় বলব, আসুক না হারাণে কামার, আসুক না যতে, তোর খুড়ো নিবারণই আসুক না, লেহ্য কথা বলব, তাতে ভয়টা কি? আচ্ছা, মাস্টারের মত লোহা চিনতে তো গ্রামে কেউ নেই? কি হে মাস্টার, এ লোহা, এ গড়ন আর কারুর হাত থেকে বেরুবে? তুমিই বল না!"

আমি কাটারিটা বাঁ হাতে ধরিয়া খুব আলগাভাবে ডান হাতের বুড়া আঙুলটা তার ধারের উপর দুইবার বুলাইয়া লইলাম, তাহার পর নখ দিয়া ধারটা খুঁটিয়া একটা আওয়াজ বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম এবং সেই আওয়াজটা ধরিবার জন্য ডান কানটা আগাইয়া লইয়া গেলাম। বলিলাম, "নাঃ, সরেস জিনিস হয়েছে, এর কাছে অন্য লোহা যে শীগগির এগুতে পারবে, মনে তো হয় না।"

হারাণকেও ঐ কথা বলি, নিবারণকেও বলি। কাহাকেও নিরাশ করিয়া বিশেষজ্ঞ হওয়ার যশ অক্ষুণ্ণ রাখা চলে না।

নিবারণ কাছে থাকিলে বলিতে হয়, "নিবারণেরই ভাইপো তো!"

দুর্লভের নিকট তামাকের আর ভুবনের নিকট কাটারির বন্দোবস্ত করিয়া অবিনাশ উঠিয়া গেল। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা বাহির করিয়া ভুবনকে ঔষধ দিলাম। সে চলিয়া গেলে টেবিলে বেতটা আছড়াইয়া একটা হুংকার করিলাম, "তোরা কি ভেবেছিস বল দিকিন? অন্য দিকে এক মুহূর্ত চোখ ফেরাবার জো নেই দেখছি যে! অন্তা, তোর কড়াকে লেখা শেষ হল? নিয়ে আয় স্লেট, আয় নিয়ে!"

অন্তার স্লেটের মাঝখানে একটা লম্বা দাঁড়ি, তাহার নিচের প্রান্তে দুইটা

ছোট ছোট দাঁড়ি দুই দিকে একটু তেরছা হইয়া নামিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রান্তদেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র বৃত্ত; তাহার মুখে পাঁচটি করিয়া ক্ষুদ্র রেখা। বড় দাঁড়ির উপরের প্রান্তে একটি মাঝারি গোছের বৃত্ত, তাহার ভিতর আবার তিনটি ছোট ছোট বৃত্ত। দাঁড়ির মাঝখান থেকে আবার দুইটি ছোট ছোট দাঁড়ি উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। একটির প্রান্তে সংলগ্ন আবার আর একটি দাঁড়ি, এরও দুই প্রান্তে দুইটি ছোট বড় বৃত্ত।

অর্থাৎ একটি লোক তামাক খাইতেছে। লোকটা অবিনাশ পুরুতও হইতে পারে, আমিও হইতে পারি, দুর্লভও হইতে পারে, শিরপোড়ো পুঁটেরও হইতে বাধা নাই। কাহারও চেহারার সঙ্গে যেমন পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তেমনই পূর্ণ বৈসাদৃশ্যও লক্ষিত হয় না।

বেতটা তুলিয়া তাহার চিত্রবিদ্যায় যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে যাইতে ছিলাম, শংকর পানের বুড়ী মা কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে হুড়মুড় করিয়া সামনে পড়িল।

"বাবা, রক্ষে কর, আর বুঝি বাঁচতে দিলে না বউটাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবার কি হল?"

"মেরে ফেললে বাবা, কি গোঙানি! কি মাথা চালা! একবার চল বাবা শীগগির, তুমি না গেলে হবে না, বামধন ওঝার মন্তরে এ যাবার নয়।"

শংকরের বউকে ভূতে পাইয়াছে। গুরুমশাই শৈল ঠাকর না হইলে ছাড়িবে না। বলিলাম, "নাঃ, তোবা দেখছি - আচ্ছা, যা, আসছি; খানিকটা সরষে, একটা পিঁড়ে, একটা ঝাঁটা, একটা ভরা কলসী ঠিক করে রাখগে। হ্যাঁ, আর একটা বেলপাতায় খানিকটা মঙ্গলচণ্ডীর সিঁদুর যোগাড় করে রাখিস,— বিধবা ভূত হলে আবার সিঁদুর ছোঁয়াবার ভয় না দেখালে ছাড়বে না।"

এই সুদ-কষা থেকে ভূত-ছাড়ানো পর্যন্ত তাবৎ বিদ্যার জোরে দীর্ঘ ছয়টি বৎসর প্রবল প্রতিপত্তিতে কাটাইয়া দিলাম। ছয়টি বৎসর ঝাড়া অর্ধ যুগ। পাঠশালার নমুনা দিয়াইছি, সকালে আশু মোক্তারের পুকুরঘাটের দৃশ্যও অনুরূপ, সন্ধ্যায় ষষ্ঠীতলার বটগাছের বাঁধা চত্বরে দৈনন্দিন গ্রাম্য সম্মেলনে শৈল ঠাকর তো একেবারে সার্বভৌম।

চমৎকার কাটিতেছিল। শাহানশা শাজাহান যদি যুগ ডিঙাইয়া স্বয়ং

আসিয়া বলিতেন, "হে সার্বভৌম, তখ্‌ত্‌-তাউস—সে তোমারই যোগ্য আসন, আমি খালি করে এসেছি; চল, অলংকৃত কর"... শৈল ঠাকুরকে নড়াইতে পারিতেন না।
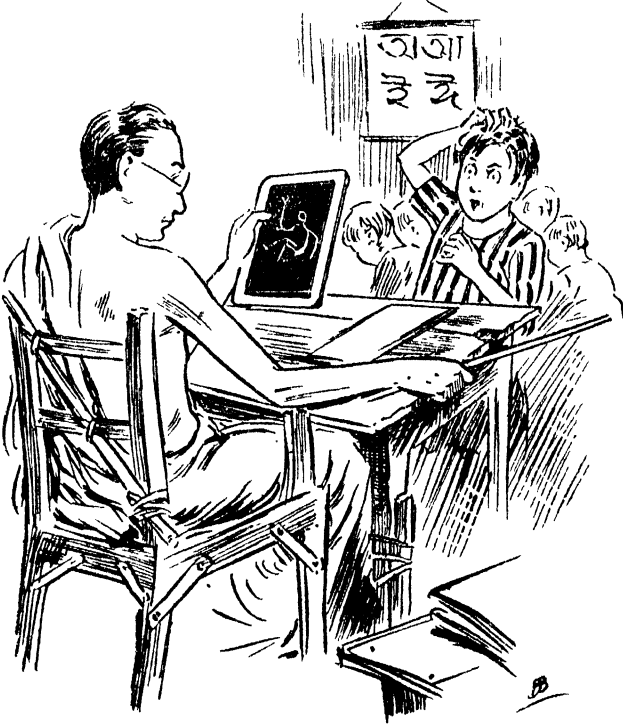
—অর্থাৎ একটি লোক তামাক খাইতেছে

কিন্তু এ আসন আমায় নিজেই ছাড়িতে হইল, স্ব-ইচ্ছায় এবং স-ভয়ে। দুঃখের কাহিনীটা সংক্ষেপেই সারিব।

সেদিন সকাল থেকেই প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। পুকুরঘাট মোটেই জমে নাই। স্কুলেও দুইজন মাস্টারই ছুটি লইয়াছেন। দুই একটা

ক্লাসে দুই একজন ছেলে আসিয়াছে, শিরপোড়ো পুঁটেকে ধরিয়া; সে মহাদেব মাস্টারের ঘরে গিয়া তামাক সাজিতেছে, প্রায় পনর মিনিট হইল।

আমি প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দুইটি যুবক সামনে উপস্থিত হইল এবং একবার আমার স্কুলের সাইন-বোর্ডটার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ছাতা মুড়িয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল।

এ প্রান্তে এ ধরণের ছেলে দেখি নাই বড় একটা। একজনের মাথায় বাবরী চুল, শীর্ণ গালে নরুণের মত গালপাট্টা, গায়ে খাটো পাঞ্জাবি, মোগলাই পায়জামা ধরণের কাপড় পরা। অপরটির প্রজাপতি-কাটের নবোদ্ভিন্ন গোঁফ, মাথায় ছাঁটা চুল, গায়ে ওল্টানো-গলা কামিজের উপর কোট, কাপড় সঙ্গীরই মত।

জামা-কাপড় প্রায় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে। নিংড়াইতে নিংড়াইতে বাবরীওয়ালা ছোকরাটি প্রশ্ন করিল, "আপনারই নাম নিশ্চয় শৈল পণ্ডিত?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, আপনারা যে ভিজে নেয়ে গেছেন! কোথা থেকে?"

"অনেক দূর থেকে আসছি, জগদীশপুর এখান থেকে তা কোশ দুয়েক হবে, কিন্তু কাজের সামনে দূরের কথা কি বৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে তো চলে না মশাই। দু'দিন থেকে যা কাটছে আমাদের, তার সামনে একটু ঝড় কি বৃষ্টি, সে তো "

দ্বিতীয় যুবকটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে তো অতি তুচ্ছ। তাই আমি বললাম, গলাবাজি করে মরছিস কেন? এ তল্লাটে এ কথার মীমাংসা যদি কেউ করতে পারে তো মন্ডলহাটীর শৈল পণ্ডিত, চল, তিনি যা বলবেন তাই মাথা পেতে "

প্রথম ছোকরা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল, "মশাই তো ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই।"

দ্বিতীয় ছোকরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া একেবারে আমার পদ স্পর্শ করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইল, বলিল, "ভুলটা দেখুন একবার! মনেই ছিল না।--মাথার কি আর ঠিক আছে?"

আমি তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কি এমন সমস্যা, যাহার জন্য এই নিদারুণ অভিযান? কিসের সালিসী, যাহার জন্য এই ভক্তির কাড়াকাড়ি? বলিলাম, "আচ্ছা, আগে আপনারা কাপড় ছাড়ুন।

পুঁটে তামাক সাজা রেখে দুখানা শুকনো কাপড় নিযে আয় তো।

স্কুলের প্রায সংলগ্নই আমাব বাসা পুঁটে আগন্তুকদেব একবাব দেখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয ছোকরা কোটের বোতাম খুলিল কামিজেব বোতাম খুলিল তাহাব পব গেঞ্জিব ভিতব হাত দিযা বুকের কাছ থেকে কাগজে জড়ানো একটি বেশ মাঝাবি গোছেব পুলিন্দা বাহিব করিয়া খুব সন্তর্পণে খুলিতে আবম্ভ কবিযা দিল। বেশ একটু পিঁযাজ ছাড়ানো করাব পব একখানি মোটা ভাঁজ করা কাগজে মোড়া দুইটি ফোটো-ব্লক ছবি বাহিব হইল।

কাপড আসিল। ছোকরা ছবি দুইটি আমাব টেবিলে পাশাপাশি সযত্নে রাখিযা দিযা বলিল দেখুন ততক্ষণ আমবা পাশেব ঘবে গিযে কাপড ছেড়ে ভিজে কাপড়চোপড়গুলো নিংড়ে নিই।

আলেখ্য দুইটি দুইজন সিনেমা জ্যোতিষ্কের। পূর্বে যেন দেখিয়া থাকিব [illegible] একাদিক্রমে পাঁচ ছয বৎসব কলিকাতাব বাহিরে থাকায এবং সিনেমা জগৎ হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকায নামধাম মনে নাই। অবশ্য স্ত্রীলোকেব প্রতিকৃতি। যুবতী তো নিশ্চযই।

কিন্তু এখানে এভাবে এ দুর্যোগেব মধ্যে ইহাদেব সমাবেশ কেন আমি নানা সংস্যাব সমাধান কবিতে পাবি কিন্তু সে সব ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীব [illegible] নিত্যজীবনেব সবল সমস্যা দুইটি আধুনিক যুবক আব অতি আধুনিক [illegible] সমস্যাব মধ্যে আমাব দৃষ্টিব প্রবেশ কোথায? [illegible] [illegible] জানি কিন্তু এব ওঝাগিবি কি করিব আমি?

[illegible] হইতেছি দুইজনে বাহিব হইয়া আসিল প্রায একসঙ্গেই প্রশ্ন [illegible] দেখলেন কি বকম দেখলেন?

[illegible] আমতা আমতা কবিয বলিলাম ইযে [illegible] মন্দ কি

জড়াজড়ি কবিযা দুইজনেই বলিয়া উঠিল মন্দ কি কি বলছেন মশাই [illegible] কলকাতাব সিনেমায যাকে বলে মানে হচ্ছে এঁদেব সামনে দাঁড়ায কে [illegible] চেহাবায বলুন হাবভাবে বলুন অ্যাক্টিঙে বলুন। এঁব নাম [illegible] আজ এঁবা মডার্ন থিযেটার্স ছেড়ে চলে আসুন [illegible] যাবে। আপনি কি বলছেন মশাই!

আমি চক্ষে অকৃত্রিম বিস্ময় এবং যতটা সম্ভব শ্রদ্ধা মিশাইয়া আলেখ্য দুইটির পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রথম যুবক কোমরে দুইটা হাত দিয়া বলিল, "এখন কথা হচ্ছে, এ দু'জনের মধ্যে আবার কে সবচেয়ে ভাল?"

দুইজনেই আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'এখন কথা হচ্ছে, এ দু'জনের মধ্যে আবার কে সবচেয়ে ভাল'

একটু পরে দ্বিতীয় যুবক টেবিলে একটা মুঠি চাপিয়া বলিল, 'ও বলছে—বনলতা, আমি বলছি—সরযূ দেবী। আজ তিন দিন থেকে আমাদের তর্ক চলছে; ওর দিকেও অনেকে হয়েছে, আমার দিকেও কম ভোট নয়। কিন্তু বেশির ভাগই তো চাষাভুষো, গায়েরই নয় জোর আছে, কিন্তু

সরযূ-বনলতার তারা কতটুকুই বা বোঝে বলুন, তাই আপনার কাছে আসা।"

সর্বনাশ! আমি চোখ তুলিয়া একবার চকিতে দেখিয়া লইলাম, দ্বিতীয় যুবক বেশ মোটাসোটা এবং প্রথমটির হাড়-বাহির-করা হইলেও বেশ কসরৎ-করা শরীর। আমি পুঁটের সাড়া লইবার জন্য বলিলাম, "হল তোর পুঁটে?"

পুঁটে চেঁচাইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এখনও ধরাতে পারি নি টিকে, স্যাঁৎসেঁতিয়ে গেছে; যা বিষ্টি!"—বলিয়া গলায় ধোঁয়া আটকাইয়া যাওয়ায় প্রবল বেগে কাসিতে লাগিল।

সাহস পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের বলিলাম, "তা নয় হল, কিন্তু এঁদের অ্যাক্‌টিং সম্বন্ধে আমার তো জানা নেই কিছু।"

আশা ছিল ঐতেই রেহাই পাইব, কিন্তু দুরাশা। প্রথম যুবক বলিল, "চেহারা সম্বন্ধেই বলুন।"

দ্বিতীয় যুবক একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "আর ফোটোর পোজ দেখে হাবভাব সম্বন্ধে যতটা আন্দাজ করতে পারেন। ওপিনিয়ন কিন্তু আপনাকে একটা দিতেই হবে। পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে গেছি একটা সমস্যায়। আমরা তো কলকাতাতেই বেশির ভাগ থাকি কিনা, ভেবেছিলাম গরমের ছুটিটা ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌ট (গ্রাম-সংস্কার) নিয়ে থাকব। এখন দুটো দল খাড়া হয়ে গেছে,—হারজিতের, মানসম্ভ্রমের ব্যাপার।"

আমার যে জীবনমরণের ব্যাপার! পাপ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য ছবি দুইটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আপনার সরযূ দেবী খুবই সুন্দর, তবে বড্ড রোগা নয় কি?"

একটু যেন রুক্ষস্বরেই উত্তর হইল, "আপনি নিশ্চয় বলতে চান—তন্বী?"

তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, বড্ড তন্বী একটু।...আর বনলতার মত সুন্দরী বড় একটা দেখি নি, খালি নাকটা যেন একটু বেশি—"

লম্বা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস হইতেছিল না। প্রথম যুবক বলিল, "গ্রীসিয়ান ছাঁচের...এই তো?"

হাঁপ ছাড়িয়া বলিলাম, "ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

অল্প একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর প্রশ্ন হইল, "তাহ'লে?"

এত অল্পে ছাড়িবে না; তবুও একবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম, "একজন হল উর্বশী,—তন্বী, গৌরী, সঞ্চারিতা লতার মত; একজন ভেনাস—শিল্পীর পাষাণের মধ্যেও সে হয়ে ওঠে কুসুমের চেয়েও পেলব, প্রভাতের চেয়েও —"

প্রথম যুবক অধীরভাবে একরকম ধমক দিয়াই বলিয়া উঠিল, "থাক্, থাক্, আপনার ভাষার চটক শুনতে বৃষ্টি মাথায় করে দু'কোশ পথ আসি নি মশায়, ফাঁকিতে চলবে না। বেশ, মিস্ বনলতা ভেনাসই হল; এখন ভেনাস উর্বশীর চেয়ে বড় কিনা বলুন, চুকে যাক ল্যাঠা।"

দ্বিতীয় যুবক একটু চতুর। সঙ্গী সালিসকে চটাইয়াছে, এ সুবিধাটা ছাড়িল না, বেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল, "না না, আপনার যেমন করে সুবিধে হয় বলুন। ওই নিন, আগে তামাক খান মশাই। যত রকম ভাবে দেখা যায় দু'জনকে দেখুন। ধরুন, বনলতা থেকে খানিকটা মাংস সরযুর শরীরে চারিয়ে দেওয়া হল, আর সরযুর নাকটা—মানে, সরযুর মত নাক বনলতার করে দেওয়া হল। দু'জনেই নির্দোষ হয়ে গেল তো? এখন বলুন, কে সুন্দর? তারপর আবার খুঁত দুটো আলাদা আলাদা বিচার করে, যার খুঁত তার শরীরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে —"

কি মারাত্মক রকম মেথডিক্যাল!

প্রথম যুবক একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "মাংস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ বনলতার নাকটাও তোর ওই তন্বী খেঁদীর মুখে বসিয়ে দে না!"

দ্বিতীয় যুবক হুংকার করিয়া উঠিল, "মুখ সামলে!"

"আলবৎ বলব। খ্যাঁদেশ্বরী!"

"তোরও তাহ'লে নাকেশ্বরী, বকেশ্বরী, ঢাকেশ্ —"

"এই তাহ'লে তোর নিজের নাক সামলা!"

আমি তাড়াতাড়ি নাক এবং উদ্যত ঘুষির মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুইজনকে থামাইয়া দিলাম।

লক্ষ্য করি নাই, বৃষ্টি কমিয়াছে, মেঘেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরিয়াছে। বাচনিক তর্কের এই হাত বাহিয়া ঘুষিতে অবতরণ একটা সুবিধাও। বলিলাম, "সমস্যাটা খুবই শক্ত— বুঝতেই পারছেন, রামী-বামীর ব্যাপার তো

নয়, এক কথায় সেরে দিলাম। উনি যে রকম বলছেন, ঐ রকম একটা লজিক্যাল মেথড ধরেই এগুতে হবে। আমায় পাঁচ দিন সময় দিন, ঠিক করে আপনাদের ওখানে নিজেই বলে আসব'খন। সমাধান করে উঠতে পারি, আগেই বলে আসব। এমন গুরুতর সমস্যা মাথায় করে আপনাদের কি ভাবে কাটবে দিনগুলো বুঝছি তো।...বৃষ্টিটা এবার বেশ ধরে এসেছে।"

ঠিক ঠান্ডা না হইলেও দুজনে কতকটা সংযত হইয়াছে; নিজের নিজের ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে।

আমার কথা শেষ হইলে প্রথম যুবক মুখ তুলিয়া বলিল "নাঃ, আপনি যাবেন কেন, আমরাই পরশু থেকে রোজ একবার করে এসে জেনে যাব'খন।"

দ্বিতীয় ছোকরা বলিল, "আমাদের নিজের নিজের সমর্থকদের নিয়ে আসব'খন সঙ্গে করে, গোপাল মন্ডলের ছেলে রসিকের দেখবেন, কি শরীর আর কি উৎসাহ!"

প্রথম ছোকরা বলিল, "মানে, যতদিন না একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে, আমাদের আসল কাজে মানে, ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌টের কাজে মন দিতে পারছি না কিনা তাহ'লে মনে রাখবেন পরশু।"

*

পরশুর আগের দিনই চলিয়া আসিয়াছি, আপাতত ছুটি লইয়া; কিন্তু আবার যাইব কি না স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অস্বীকার করিব না, প্রতিপত্তির নেশা এখনও লাগিয়া আছে একটু। নেশাই তো' তবুও খুব সতর্কভাবে খোঁজ লইতেছি, ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌টের জন্য ওপ্রান্তে আরও সব চারিদিকে কি রকম সেবক-সমাগম হইতেছে।

ভারত-উদ্ধার ও পাঁঠা

নিরামিষ, অর্থাৎ নুন, ছোলা আর আদা খাইয়া ভারত-উদ্ধার করা কি একেবারেই অসম্ভব? — পাঁঠা কি খাইতেই হইবে?

বহুদিন পূর্বে — ছেলেবেলার একটা কথা আজ মনে পড়িয়া গেল বলিয়া প্রশ্নটা করিতেছি। কথাটা ভুলিবার নয়, — মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

যখনকার কথা, তখন 'ভারত' কাহাকে বলে জানি না, 'উদ্ধার' কাহাকে বলে তাহা আরও জানি না। দেশের হাওয়াটা গরম আর সেই গরম হাওয়া থেকে এইটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি যে সায়েবদের সঙ্গে আর 'হেসে কথা কওয়া' নয়, দেখিলেই চাঁটি বসাইতে হইবে। তাহার জন্য প্রচুর ক্ষমতার দরকার। কষিয়া ডন্, কুস্তি, বৈঠকে মাতিয়া গেলাম সবাই।

সবাই মানে — আমি, গোবরা, যুগল, ফ্যালারাম আর মুকুন্দ। আরও এক-আধ জন ছিল বোধ হয়, এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না। ছেলেবেলার কথা তো সব থাকে না মনে... তখন কতই বা বয়স আমাদের? কাহারও বারো, কাহারও দশ; যুগলের বোধ হয় বছর-তেরো হইবে।

লাহিড়িদের পোড়ো বাড়ির খিড়কির দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আমরা আখড়া বানাইয়া ফেলিলাম। জায়গাটা খুব নিভৃত, একটেরে; পিছন দিকটা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, সামনের দিকটায় দোতলা বাড়িটা। পিছনের দেওয়ালের পরেই ঘন জঙ্গল নোড়, পেয়ারা, আম, জাম, আমড়া, কলার ঝাড়; তার নিচে আস্‌সেওড়া, কচু, বিছুটি, — কোন ইংরেজ যদি নিজেদের বিপদের কথা টেরও পায় তো সহজে যে আসিয়া পড়িবে এমন আশংকা নাই।

জায়গাটাতে সকালবেলায় হাত মুখ ধুইয়াই আমরা আসিয়া উপস্থিত হইতাম; ডন্ হইত, বৈঠক হইত, কুস্তি হইত, মুগুর ছিল। এই সমস্ত করিয়া যখন যথেষ্ট শক্তি হইবে সে-সময় কোন সায়েব দুর্ভাগ্যক্রমে হাতে আসিয়া পড়িলে কি করিয়া তাহাকে বাগাইতে হইবে সে জন্য একে অন্যের ঘাড়ে লাফালাফির ব্যবস্থাও ছিল। ব্যাপারটা নিতান্ত নির্দোষ নিরাপদ ছিল না, — ফুলিয়াও যাইত, কালসিটেও পড়িত, একটু-আধটু রক্তপাতও হইত না

যে মাঝে মাঝে এমন নয়। তবে চোখে জল আনিবার রেওয়াজ ছিল না। জল আসিয়া পড়িলে তাহাকে 'ভীরু' বলা হইত। 'ভীরু' কথাটা মাত্র কয়েকদিন ব্যবহার হইয়াছিল, তারপর যুগল বলিল, 'ভীরু' না বলে ওকে 'সায়েব' বল। ..যুগল আমাদের সর্দার ছিল।

মোট কথা, দিব্যি, ঘেরা-ঘোরা একটা জায়গার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে থাকিয়া একটা জাতকে মনে মনে যতটা নিচু করা যায় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

এই সব করিয়া গিয়া ভিজান ছোলা, আদা আর নুন চিবাইতাম।

পাঠশালের পরে বিকালে আবার ঐ ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্যটাও যে নিতান্ত অনির্দিষ্ট ছিল এমন নয়। মসজিদপাড়ার গোড়াতেই একটা ফিরিঙ্গি-পরিবার ছিল, তাহাদের প্রায় বছর বারো তেরোর ছেলেটার ওপর বরাবর আমাদের তাক্ ছিল।

কালো চামড়া বলিয়া দু'-এক জন একটু গুঁইগাঁই করিয়াছিলাম, যুগল বলিল, "লোকে একেবারেই এম-এ পাস করে না; এ, বি, সি থেকে আরম্ভ করতে হয় হে চাঁদ' ওর ওপর দিয়েই হাত পাকাও আগে। একেবারে কেউটে ধরে না।"

মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যুক্তিটা অকাট্য। স্যামুয়েলের জন্যই আমরা তর্কে তর্কে রহিলাম।

একদিন বিকালে যুগলের আসিতে বড্ড দেরি হইল। বাড়ির ভিতর দিয়া আগাছার জঙ্গল চিরিয়া সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে। বেশ গা-ঢাকা-গোছের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অনুশীলন শেষ করিয়া আমরা উদ্বিগ্নভাবে পথের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় দূর হইতে দেখি নূতন কে একজন অতিশয় মন্থর গতিতে আমাদের পানে চলিয়া আসিতেছে; গতিটা সুধু মন্থর নয়, একটু যেন একপেশে অর্থাৎ ডান দিকটায় একটু যেন খোঁড়াইতেছে লোকটা। সন্ধ্যার আবছায়ায় কি রকম হঠাৎ একটা আতঙ্ক হইল, যুগল নাই, তাহার উপর এ আবার নূতন মানুষ কে আসে' বোধ হয় পলাইবারই পথ খুঁজিতেছিলাম এমন সময় আগন্তুক হাত তুলিয়া থামিতে ইসারা করিল। ততক্ষণে কাছেও আসিয়া গিয়াছে, দেখি আমাদের যুগল। ভয় গিয়া তীব্র বিস্ময়ে সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম।

যুগলের নাকের বাঁ-দিকটা ফুলিয়া ঠেলিয়া আসিয়াছে, মুখের ডান-দিকটা এমন ফুলিয়া গেছে যে ঠোঁট দুইটাকে যেন মনে হইতেছে একটা ছোট পাঁউরুটি। কপালে একটা এতখানি কালসিটে—চোখ দুইটার নাকের দিকের কোণ দুইটা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। এদিকে মালকোঁচার কাপড় ছিঁড়িয়া ফাতরাফাঁই হইয়া গিয়াছে, পাঞ্জাবিটা গলার সামনাসামনি শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া আসিয়া কোটের মত দুইধারে সরিয়া গিয়াছে।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, "ব্যাপার কি রে যুগলো?"

যুগল মুখ নাড়িয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখটাও ভাল করিয়া নাড়িতে পারিল না, কিছু বোঝাও গেল না। মুকুন্দ বলিল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না, ভাল করে বল্।"

যুগল ঝাঁঝিয়া উঠিল। তাহাতে কথাটা যদিও আরও জড়াইয়া গেল, কিন্তু আওয়াজটা জোর হওয়ায় বোঝা গেল। ঝাঁঝিয়া বলিল, "বলছি—সুধু নুন-ছোলার কাজ নয়, পাঁটা খেতে হবে। তা কালার মত খালি—ভাল করে বল্, ভাল করে ব..."

"উঃ" করিয়া হাত দিয়া মুখের ডান-দিকটা চাপিয়া যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করিয়া বসিয়া ডাইনে-বাঁয়ে দুলিতে লাগিল।

ব্যাপারটা চোখের সামনে যতটুকু দেখিতেছি তার সঙ্গে নুন-ছোলার উপর পাঁঠা চাপানোর কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া সকলে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। দারুণ কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু যুগলের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া মেজাজ দেখিয়া কেহই আর ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না।

একটু পরে যুগল নিজেই কথা কহিল; প্রশ্ন করিল, "মুখটা খুব ফুলে গেছে, না রে?"

গোবরা উত্তর করিল, "ভেবেছিলাম - তুই বুঝি মুখোস প'রে ভয় দেখাতে আসছিস সন্ধ্যে হয়েছে দেখে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "বোলতা না কি রে যুগল?"

যুগল কপাল, নাক এবং ঠোঁটের উপর আলগা ভাবে হাতটা বুলাইতে বুলাইতে বিরক্ত ভাবে বলিল, "হাঁদার মত কথা ক'সনে শৈল; বোলতা

কামড়ালে এমন খাপছাড়া হয়ে ফোলে কখন' মাদার-ফলের মত হয়ে গেছে মুখটা।'

একটু চুপ করিয়া কতকটা রাগিয়াই ফ্যালারামকে প্রশ্ন করিল, 'একলাই

মুখটা খুব ফুলে গেছে না রে?'

স্যামুয়েলকে সায়েস্তা করতে পারব বলতে গেলি কেন রে কাল? উঃ ফোলাটা চড় চড় করে বেড়ে উঃ "

ফ্যালারাম বলিল দেখলাম তুই একলা কাল গোবরা আর মুকুন্দর মোষাড়া নিলি, তাই "

যুগল মুখের উপর হাতটা চাপিয়া বলিল, "বকাস নি বলছি ফ্যালা। তোদের ফূর্তি বেড়েছে। মিছিমিছি উস্‌কে দিয়ে "

মুকুন্দ বলিল, "তুই একলা যেতে গেলি কেন, আমাদের কাউকে "

যুগল ঘাড়টা তাহার পানে একটু ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, না পারিয়া সামনের দিকেই চাহিয়া বলিল, "বাহাদুরি রাখ্। .যা না, তোরা তো পাঁচজন রয়েছিস।"

কথা বাড়াইয়া ফল নাই দেখিয়া সবাই আবার চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে মুকুন্দ বলিল, "ওদের সুবিধে- ওরা বক্সিং জানে, তাই "

চোখ দুইটা আরও বুজিয়া আসিতেছে, চাড়া দিয়া চাহিয়া যুগল বলিল, "থাম্, বক্সিং যেন দেখি নি কখনও। বেটা যেন দশভুজার মত ঘুষি চালাতে আরম্ভ করে দিলে- বাগিয়ে ধরতে না ধরতে। পাঁঠার ব্যবস্থা যদি না হয় তো ছেড়ে দে এ-সব ধাষ্টামি। চাল কলা, কি নুন-আদা খেয়ে ও-ব্যাটাদের . "

অনেকখানি বকিয়া যুগল ক্লান্তভাবে হাতে মুখটা রাখিয়া ঘাড় কাং করিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে গোঙাইতে লাগিল।

গোবরা ভীত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলিল "তবুও আসল সায়েব নয়, ফিরিঙ্গি তাও আবার ক'টা চামড়াও নয়। কিন্তু পাঁঠা পাওয়া যাবে কোথায়?"

ফ্যালারাম বলিল, "তাই তো। হপ্তায় একবার করেও তো খেতে হবে? ওরা রোজ মাংস চালাচ্ছে, তাও আবার মুরগীর। সকালে যখন ডাকে, গলার জোরেই বোঝা যায় ওগুনোর গরমাই কত।"

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিতেছে। ওদের উপর, বিশেষ করিয়া স্যামুয়েলের উপর আক্রোশে মনটা জ্বলিয়া যেন খাখ্ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পাঁঠার কোন উপায়ই না দেখিতে পাইয়া সুধু মাঝে মাঝে নিষ্ফল আক্রোশের দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে এক একটা।

একটু পরে ফোলা নাকে খুব একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যুগল বলিল, "ওঠ্, রাত হয়ে গেল।.. ও-ব্যাটাদের জয়-জয়কার এখনও কিছু-দিন।...দেখ্ না, সবার বাড়িতেই পুজো হয়, তা এক মা-কালী ছাড়া সব

আমি দরদের সঙ্গে বলিলাম, "বোলতা কামড়ানোর কথাই বলিস যুগলো, মা-শেতলার দয়ায় তোর মুখটা সেই রকম নিটোল হয়ে ফুলে আসছে, না রে ফ্যালা? আর আছে ততটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো?"

সবাই যেন বড্ড মন-মরা হইয়া গেলাম। অবশ্য যুগলের মুখের ফোলাটা দুই তিন দিনের মধ্যেই কমিয়া গেল কিন্তু আর তেমন গা নাই যেন কাহারও, কতকটা হাল-ছাড়িয়া-দেওয়া গোছের ব্যাপার। আখড়ায় আসিতে হয় আসি, একটু-আধটু ডন্‌-বৈঠকও যে না হয় তা নয়, কিন্তু স্যামুয়েল-ঘটিত ব্যাপারটার আগে ভারত-উদ্ধারের উদ্দীপনায় তাহাতে যেমন একটা উগ্রতা ছিল, স্যামুয়েলকে মনে মনে চোখের সামনে দেখিতে দেখিতে ডন্‌-বৈঠক করিতে করিতে যেমন ঘামিয়া উঠিতাম আর সে-জিনিসটি নাই। কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। বেশির ভাগ সময়ই কাটে পাঁঠা জোগাড়ের গল্প করিয়া; কোন উপায়ই ঠাহর করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ মনে যে-যার বাড়ি চলিয়া যাই। ছোলাতে আর ভক্তি নাই। কোনদিন ভিজাইতেই ভুলিয়া যাই, কোনদিন বা আদাই থকে না; নেহাৎ শপথ লইয়া ধরা,-আঙুলের ডগায় গোটা দশ-বারো ছোলার দানা মুখে ফেলিয়া দিয়া অশ্রদ্ধার সঙ্গে চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া যাই। ভীমের আদর্শে ভাতের সঙ্গে ফেন চলিতেছিল, এখন পানসে বোধ হয়। স্যামুয়েল যে কি মোক্ষম ঘা দিল!

হ্যাঁ, আর একটা কথা। - স্যামুয়েলের খোঁজও করা হইয়াছিল, সকলে একজোট হইয়া। দেখা গেল, সে আর একটা ছেলেকে সাথী করিয়া লইয়াছে। দুই দশভূজার সম্মিলিত ঘুষির হিসাব করিয়া আর কেহ ঘেঁষিলাম না।

তারপর একদিন যুগলই সমস্যার সমাধান করিল। একদিন দেখি, হঠাৎ চরণদাসের মা'র নাতিকে আনিয়া হাজির। এরা জাতিতে বাগ্দী। চরণদাস মারা গিয়াছে, তাহার বুড়ী-মা এই বছর-দশেকের নাতিটিকে লইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। বুড়ীর বাড়ি সংলগ্ন খানিকটা জমি আছে, একটা ডোবা আছে; তরিতরকারিটা, মাছটা বেচিয়া চলিয়া যায়। একটা গরুও আছে; আর আছে একপাল ছাগল - মাদী-মদ্দ, ধাড়ি-বাচ্ছায় অনেকগুলি।

তখন রাখিবন্ধন প্রভৃতির হুড়াহুড়ি খুব। যুগল বলিল-- "আর এক ভাইকে ডেকে নিয়ে এলাম, তোমরা সবাই কোল দাও এক এক করে।"

সবাই একে একে সুদামকে আলিঙ্গন করিলাম। যুগল তাহার কপালে আখড়ার মাটির তিলক দিয়া বলিল, "ভারত-উদ্ধার করতে হবে সুদামভাই!"

সুদাম নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় নাড়িল, যেন ব্যাপারটা নারিকেল গাছে ওঠার মত বা জলে ঝাঁপাই ঝোড়ার মতই নিভাবনার কথা। একটা অস্পষ্ট গোছের ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাড়ি কিংবা চারিদিকের জঙ্গলের মধ্যে কিছু স্পষ্টতর অর্থ খুঁজিয়া পায় কি না দেখিবার জন্য একবার বিমূঢ়ভাবে চারিদিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "তার জন্যে এখন তাহ'লে কি করব?"

তাহার সুপুষ্ট শক্তিমান দেহ দেখিয়া আমি বলিলাম, "একবার স্যামুয়েলকে আচ্ছা করে যদি..."

যুগল কড়া চোখে ইসারা করিয়া আমায় থামাইয়া দিল। সুদামকে বলিল, "আজ তোর প্রথম দিন, এখন গোটাকতক ডন্-বৈঠক করে নিয়ে বাড়ি যা। ছোলা ভিজিয়ে রেখে এসেছিলি?"

সুদাম বলিল, "হিঁ; আর একটা ছাগলের ছানা মরে গিয়েছিল, সেটাও রান্না আছে, সকালে ঠাকুমা-বুড়ীতে আমাতে আদেকটা খেয়েছিনু, বাকিটা রয়েছে।"

সুদাম চলিয়া গেলে যুগল আমার পানে চাহিয়া খিঁচাইয়া বলিল, "এ ক্যাবলাকান্তের যার সঙ্গেই দেখা, খালি 'স্যামুয়েলকে ঠেঙাও'...তুই নিজে যা না!"

তারপর একটু থামিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "সুদেকে এক মতলব করে টানলাম। ও-ব্যাটা বাগ্দীর পো 'ভারত-উদ্ধার' করবে, না ছাই করবে, বলে আমরাই এত করে থই পাচ্ছি বড়!...ওকে ভিড়োলাম এক মতলব করে।"

আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টির পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "ওর ঠাকুমার অনেকগুলো ছাগল; বাচ্চা থেকে নিয়ে সব সাইজের পাঁঠা হরদম মজুদ রয়েছে..."

সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। গোবরা বলিল, "সুদে আনবে বলেছে?"

ফ্যালারাম বলিল, "তাহ'লে মাঝারি সাইজের আনতে বলিস যুগল..."

মুকুন্দ বলিল, "হ্যাঁ, একেবারে কচিগুলো কিছু নয়—ঘাস যেন..."

যুগল সবার মুখের পানে একে একে চাহিয়া শাসনের ভঙ্গিতে বলিল, "ব্যাস, সবাইয়ের নোলায় জল এসে গেল। শোন্, এই বারণ করে দিচ্ছি, পাঁঠা আদায়ের মতলবে ডেকেছি যদি বলিস ওকে কেউ, তো তার কিছু বাকি রাখব না। ও ব্যাটা মাংনায় পাঁঠা জোগাবার পাত্তোর কি না! আর চাইলেও ওর ঠাকুমা-বুড়ী দিচ্ছে অমনি! ডাকসাইটে কেপ্পন মাগী। ও একটু এসে জমে বসুক, তারপর মতলব কবে বেব করতে হবে, ততদিন তোবাও ভাবতে থাক্, আমিও মাথা ঘামাই, যাব মতলবটা লাগসই হয়।"

সুদামের জমিয়া বসিতে দেরি হইল না। বাংলা দেশেব মধ্যে ওদের নাড়িতেই যা একটু গরম রক্ত আছে, কোস্তা-কুস্তিব ব্যাপাবে একেবাবে মাতিয়া উঠিল। আখড়া খোঁড়া জঙ্গল পবিষ্কাব, ডন্ বৈঠক, মুগুব ভাঁজ, কুস্তি একধাব থেকে সব সাঙ্গ করিয়াও একটুও যেন ক্লান্তি আসে না, আরও কিছু চায়, এক-একদিন একটু অসহিষ্ণু ভাবে যুগলকে প্রশ্ন কবে, "বামুনঠাকুর, তিনি আছে কোথাকে? —সেই যে কাকে উদ্ধাব কবতে হবে বলছিলে।"

সুদামকে সবাইয়া দিয়া এক একদিন আমাদেব পবামর্শ হয়। যুগল বলে, 'কিন্তু সুদেব শবীব হয়েছে দেখেছিস? নুন ছোলা খাওয়া নাড় নয় তো যে কিন্তু কি কবে সবান যায় পাঁঠা? বুড়ী যক্ষীব মত আগলে বসে আছে।'

অবশেষে একদিন সুদামেব কাছেই কৌশলে পাড়া হইল কথাটা। সুদাম 'ভাবত উদ্ধাব' সম্বন্ধে অধীবতা দেখাইলে যুগল বলিল, 'সে তো তোব একাব কাজ নয় সুদাম, আমরা ক'জনই তোযেব না হলে তো হবে না।'

সুদাম একটু যেন নিবাশ হইয়া বলিল, 'কেন বীব-হনুমান তো এক বকম বলতে গেলে একাই—"

যুগল বলিল, "ভারত তো আব মা জানকী নয় যে অশোকবনে বসে কান্নাকাটি কবছে—হনুমান একাই গিয়ে—"

সুদাম একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন কবিল, 'তবে?'

চেলাব চেয়ে গুবুর জ্ঞান যে এমন কিছু বেশি তা নয়, যুগল কি করিয়া বুঝাইবে কোন হদিস না পাইয়া একবার আকাশ থেকে আরম্ভ করিয়া পোড়ো বাড়িটা মায় আখড়া পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, চেলাব এ-রকম

অসুবিধাজনক অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়াই বলিল, "সে তুই ঠিক বুঝবি কি এখন?—'ভারত-উদ্ধার' মানে—মানে—সাযেব দেখলে দু-ঘা বসিয়ে দেওয়া—ইস্কুলে, পাঠশালে ইংরিজী পড়া মুখস্থ না করা, স্বদেশী কাপড় পরা... আর এই ধর..."

আমরা সকলে গোড়াতেই মতলব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম -একথা সেকথা করিতে করিতে সুকৌশলে আসল কথাটা পাড়িতে হইবে সুদামের কাছে আজ। বাজে কথা আসিয়া পড়িয়া দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবরা আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, বলিল, "কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পাঁঠা খাওয়া।"

সুদাম একটু বিস্মিত হইয়া চাহিতে যুগল গোবরার পানে চাহিয়া একটু রাগিয়া বলিল, "ভেঙে বল কথাটা তা নয়, মাঝখান থেকে 'পাঁঠা খাওয়া'! পাঁঠা তো ওর ঠাকুমা-বুড়ীও খায় ক'টা 'ভারত উদ্ধার' করেছে?"

তাহার পর সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "সে কথা নয়, কথা হচ্ছে চাল-কলা খেয়ে তো সায়েবদের সঙ্গে ভেড়া যায় না, এক একখানা লাস দেখেছিস তো? ওরা দু'-বেলা মাংস চালাচ্ছে, তাও মুরগীর মাংস, সেই জন্যে..."

সুদাম হাতে আখড়ার একটা ঢেলা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, "পাঁঠা তো আম্মো খাই; সকালে বাসি-কবা খেয়ে এনু।"

যুগল বলিল, "তুই একা খেলেই হবে? একা একা তাবৎ সায়েব গুলোকে ঠেকাতে পারবি? "

ফ্যালারাম নিচু মুখে একটা খড় চিবিতে চিবিতে কথার গতিবিধিটা লক্ষ্য করিতেছিল। হাত থামাইয়া সুদামের পানে চাহিয়া বলিল, "তাই যুগল বলছে - আমরা আখড়ার সক্কলেই যাতে পাঁঠার মুখ দেখতে পাই তার ববস্থা করতে হবে।"

গোবরা বলিল, "আর, এক আখড়ার একজনে পাঁঠা খায়, আর বাকি সব ছোলা চিবোয় এটা ঠিকও নয়।"

মুকুন্দ টীকা করিল, "এক আখড়ার সবাই গুরুভাই হোল কি না। বোষ্টোম তো সবাই বোষ্টোম, আর কি যে বলে--পাঁঠা খায় তো সবাই পাঁঠা খায়।"

প্রসঙ্গটা এই পর্যন্ত আসিয়া একটু বন্ধ রহিল, তাহার কারণ এবার সুদামের কিছু বলার পালা, কথাটা তাহার দুয়ার পর্যন্ত পেঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুদাম কিন্তু 'হ্যাঁ', 'না', কিছুই না বলিয়া একটা ঘাসের শিষ তুলিয়া দাঁতে কাটিতে লাগিল।

যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরও যখন কিছু বলিল না, ফ্যালারাম কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "তাই যুগল বলছিল, ওই সুদাম যদি মাঝে মাঝে যোগাড় করতিস পাঁঠা তো আমাদের মস্ত বড় একটা সমিস্যে মিটে যেত।"

তাহাতেও উত্তর নাই দেখিয়া একটু থামিয়া বলিল, "অবিশ্যি তোর ঠাকমাকে বলে।"

সুদাম ভ্রূ নাচাইয়া বলিল "তুমিই গিয়ে কয়ে দেখ না বুড়ীকে, দেখব কেমন বুকের পাটা।"

গোবরা বলিল, "বলতেই যে হবে তার মানে কি? একটা ভাল কাজের জন্যে নেহাৎ দায়ে পড়ে পাঁঠা খেতে হচ্ছে এতে না বলে সরিয়ে নিলে পাপ হয় না।"

মুকুন্দ বলিল, "তাহ'লে তো দুর্গো পুজোর জন্যে মল্লিকদের বাগান থেকে অত কষ্ট করে যে গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে আসি সেও পাপ।"

সুদাম বলিল, "পাপের কথা হচ্ছে নি, কথা হচ্ছে ও খান্দাৎ মাগীর দিষ্টি থেকে সবাবে সে এখনও মায়ের পেটে আছে। নৈলে আমিই কি নিয়ে আসতে পারতুম নি করে একটা মরবে সেই ভরসায় বসে থাকতে হয়।

গোবরা বলিল "তোর ঠাকুমা গুণতে পারে কত দূর পর্যন্ত বল দিকিন, তোদের তো ধাড়িতে বাচ্চাতে অনেক পাঁঠা পাঁঠী। আমার পিসী তিন দশ পর্যন্ত গোণে কোন রকমে, তারপর গুলিয়ে ফেলে মাল সরাবার সুবিধে হয় তাতে।"

যুগল একদৃষ্টে সামনে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিল, হঠাৎ সুদামের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোর ঠাকুমা মানৎ-টানৎ করে না ঠাকুরদের কাছে?"

সুদাম বলিল, "আগে করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে।"

"একবার ক্ষীরী-ছাগলটা পর্শো হবার সময় বুড়ী মা-শেতলার কাছে জোড়া-পাঁঠা মানৎ করলে। ক্ষীরীর সুচ্‌রংকুলে যেই বাচ্চা হল, আর গা করে না মাগী। মা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেয়, বুড়ী এলাকাবি দেয়, একের লম্বর ঝানু কিনা, বলে—ঐ ক্ষীরীর বাচ্চাই দোব, একটু গোস্তো হোক গায়ে,—অন্য ছাগলীর ছাওয়াল মেরে উলটে পাপ করতে যাব কেন?...মা-শেতলা আবার ঠাকুমার বাবা তো?- এসা পেটে ব্যথা ধরল ক্ষীরীর,--যায় যায়! ঘাট মেনে বুড়ী দুটোর জায়গায় তিনটে পাঁঠা দিয়ে এলো। কিন্তু সেই থেকে বড্ড চটে গেছে,- আর মানতের দিকে যায় না।"

যুগল বলিল, "সে কথা হচ্ছে না, মানে ভয় করে তো মা-শেতলাকে?"

সুদাম বলিল, "যমের মতন। আর কাকেই বা ভয় করে মাগী ধরাতলে? তোমরা বামুন-মাকে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করাও না, দা-ঠাউর, খাইয়ে পাঁঠায় অরুচি ধরিয়ে দিই।"

কয়েকদিন আরও গেল।

আখড়ায় একটু মন্দা পড়িয়াছে। যুগলের ভাবটাও একটু বিমর্ষ, মন মরা-গোছের। মাঝে মাঝে আসেও না আড্ডায়-কোথায় যে থাকে টের পাওয়া যায় না। আর সবাই আসি আমরা, কিন্তু যুগল হইল আড্ডার প্রাণ স্বরূপ,- জমে না।

তাহার পর উপরি উপরি তিন দিন অনুপস্থিত থাকিয়া একদিন আসিয়া বলিল, "মা মুখ তুলেছেন রে, এবার খা কত পাঁঠা খাবি।"

ব্যাপারটা ভাঙিয়া বলিল-আর কোনও উপায় না দেখিয়া যুগল মা-শীতলার শরণাপন্ন হইয়াছিল। রোজ সকালে গিয়া ডাবের জল ঢালিয়া আসিত, ছুটি পাইলেই চিলেকোটার ঘরে গিয়া ধর্না দিত, শুইবার সময়ও মাকে স্মরণ করিয়া শুইত।

মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,...সুদামের ঠাকুমা জ্বরে পড়িয়াছে।

যুগল বলিল, "সুদেকে ডেকে এসেছি, সে একটু ছাড়া পেলেই আসবে চলে।...কিন্তু আসল জিনিসই পাওয়া গেল না এখন পর্যন্ত।" হঠাৎ ফ্যালারামের পানে চাহিয়া বলিল, "হয়েছে!...ফ্যালা, তোর বাবার তো গড়গড়া আছে, তার সট্‌কাটা জোগাড় কর না।"

আমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে যুগলের মুখের পানে চাহিলাম।

যুগল বলিল, 'সুদে আসুক, বলছি।

ফ্যালারাম বলিল, সট্‌কার সঙ্গে তামাকও আনব নাকি যুগলো? বাবা কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা ফৌজদারী বালাখানা এনে রেখে গেছে।

যুগল আর ফ্যালারাম কিছুদিন আগে তামাক ধরিয়াছে একটু একটু তামাকটা সিগরেট অর্থাৎ বিলিতী জিনিস নয় সেই খাতিরে'বা ভক্তিতে। যুগল একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, তা আনিস। দেখিস তোর বাবা এসে না আবার টের পায়।

কথাবার্তার মধ্যে সুদাম আসিয়া পড়িল। জ্বরটা যে যুগলেরই কীর্তি শুনিয়া বলিল, টেঁসে যাবে নি তো? বড্ড কাৎরাচ্ছে।

যুগল বলিল, টাঁসবার জন্যে তো জ্বর করান নি মা শেতলা, আমাদের কাজ হাঁসিল হয়ে গেলেই আবার চাঙা করে দেবেন। সব ওঁরই হাতে তো? আর এমনি কি শুনতেন? নেহাৎ দেখলেন এরা ভারত-উদ্ধারের জন্য করেছে, দুটো দিন কাৎ করে দিলেন বুড়ীকে। এখন আসল কাজ যাতে আজই রাত্রে হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, বুড়ো মানুষ মিছিমিছি কষ্ট বাড়ানর দরকার কি? আমি মতলব ঠাউরেছি।"

আমরা সকলে ঘিরিয়া বসিলাম যুগলকে। সে বিশদ ভাবে আমাদের কাছে তাহার মতলবটি বুঝাইয়া দিল।

সব শুনিয়া সুদাম বলিল, কিন্তু স্বপ্নটাও যদি মাকে দিয়ে বলিয়ে দিতে পারতে। বড় হাঙ্গামা আর যদিই কোন রকমে টের পায় বুড়ী তো—

যুগল ভারিক্কে হইয়া একটু বিরক্তির সহিতই বলিল, যা বলছি তাই কর নৈলে যাবে অক্কা পেয়ে বুড়ী। তোরা জেতে বাগ্দী ঠাকুরদেবতার কথা বুঝিস না। একটা আবদার করলাম শুনলেন, সব কাজ ওঁদের ঘাড়ে চাপান ঠিক নয়।

সেই দিন প্রায় রাত নটার সময় আহার করিয়া আমি, যুগল আর ফ্যালারাম শীতলাতলায় যাত্রা দেখিবার নাম করিয়া সুদামের বাড়িতে আস্তে

আস্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গোবরার ভূতের ভয় বেশি, মুকুন্দর বাপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, তাহারা আসিতে পারিল না।

ফ্যালারাম তাহার বাপের গড়গড়ার নলটা লইয়া আসিয়াছে। তামাক জোগাড় করিতে পারিয়া ওঠে নাই।

যুগল একটা সংকেত করিতেই সুদাম বাহির হইয়া আসিল। যুগল প্রশ্ন করিল, "কি রকম?"

সুদাম বলিল, "নিঝুম হয়ে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে এক-আধবার কাৎরাচ্ছে। তবে সন্ধ্যের চেয়ে ভালোই।"

সুদামের বাড়িটা একটু একটেরেয়। একেবারে কাছে কোন ঘর নাই। আগাছার মধ্য দিয়া আমরা ঘরের পিছনে চলিয়া গেলাম। পাঁঠা-অভিযানের পথে যে সাপ-খোপেরও সাক্ষাৎকার হইতে পারে সেদিকে খেয়াল নাই।

যুগল ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কোন্‌খানটা শুস তোরা, দেখা।"

ছেঁচা-বেড়ার ঘর, অনেক উঁচুতে মাঝখানে একটা জানালা। সুদাম আন্দাজে তাহাদের বিছানার জায়গাটা বাৎলাইয়া দিল।

যুগল বলিল, "এবার তুই যা ভেতরে। আমি গলিয়ে দিচ্ছি নলটা, তারপর আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে তোর ঠাকুমার মাথার ঠিক নিচে, বালিসের তলায় মুখটা ঢুকিয়ে রেখে দিবি। তারপর সব ঠিক হ'লে দুটো টোকা মারবি।... যা যা ব'লে দিছলাম সব মনে আছে তো? যা এবার।"

যুগল প্রয়োজনীয় অস্ত্র আনিয়াছিল। ছেঁচা-বেড়াটা খুব সন্তর্পণে একটু ফাঁক করিয়া নলটা গলাইয়া দিল।

একটু পরেই দুইটা টোকা পড়িল।

নলে মুখ লাগাইয়া যুগল চাপা স্বরে ডাকিল, "বুড়ী—বুড়ী!.."

থামিয়া আর একটু জোরে ডাকিল, "বুড়ী, শুনছিস?"

ছেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়া একটা গ্যাঙানির শব্দ ভাসিয়া আসিল। ফ্যালারাম ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "শুনেছে এবার।"

যুগল বলিল, "আমি মা-শেতলা। ক্ষীরীর বিয়ো. "

ফ্যালারাম চাপা গলায় টিপিয়া দিল—"শুদ্দু করে বল্—ঠাকুরে কথা কইছে যে।"

যুগল সটকার মুখে চালান দিল--"ক্ষীরীর প্রসবের কথা মনে আছে? সেই যে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে... ফাঁকি দেবার সুখটা আছে মনে?..."

গ্যাঙানিটা বাড়িয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—জ্বরের ঘোরে কাঁপা আওয়াজ -"সুদু জেগে আছিস?"

সুদাম গভীর ঘুমের আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিল, "কেন ঠা'মা, জল খাবি?"

"না ঘুমো; একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখনু তাই বলছি।"

"মরগা; কিসের স্বপ্ন দেখলি? স্বপ্ন, না জ্বরের তারোস?"

"না রে, মা-শেতলার স্বপ্ন দেখনু।"

"কি বলে?"

"ক্ষীরী ছাগলীর কথা বলছিল মা।"

"বলবে নি? তুই জোড়া-পাঁঠার মানৎ করে অত ভোগা দিলি ."

একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর বুড়ী দুই-তিন বার কি যেন একটা শোঁকার আওয়াজ করিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সুদু, তামাকের বাস আসছে কোথা থেকে বল দিকিন?"

আমরা ভয়ে কাঁটা হইয়া গেলাম। যুগল নলটা একবার নিজের নাকে দিয়া আমাদের দুইজনের নাকে ঠেকাইল। সত্যই কড়া তামাকের গন্ধ পুরান নলটাব ভিতর ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিতেছে।

বুড়ী আরও দুই-তিনবার হ্রস্ব নিঃশ্বাস টানিয়া বলিল, "নাঃ, সত্যিই যেন রে! পাচ্ছিস না তুই সুদু?"

দারুণ উদ্বেগে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি।

যা হোক সুদামটার বুদ্ধি আছে। খানিকটা চুপ করিয়া বলিল, "না, আমার তো স্বপ্ন নয়, পাবো কন'থে?"

একটু চুপ করিয়া বলিল, "মা শেতলার সঙ্গে বোধ হয় হুঁকো-হাতে মহাদেবও এসেছে ঠা'মা, তিনি আবার মায়ের বর হয় কিনা; সেই জন্যে তামাকের গন্ধ পাচ্ছিস। বলে দে হপ্তায় হপ্তায় একটা করে পাঠা বলি দিয়ে বামুনদের পেসাদ বিলি করব। তারপর ঘুমিয়ে পড়, দুজনেই চলে যাবে'খনি।... শুনছিস ঠা'মা?—মিছিমিছি ঠাকুরদেবতাদের মেলা দাঁড় করিয়ে রাখিস নি, তানাদের মাত্তোর একটা কাজই নয় তো..."

প্রায় মিনিট পনর-কুড়ি আমরা বুড়ীর এই প্রতিজ্ঞাটুকুর আশায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ওদিকে নাক-ডাকার শব্দ আরম্ভ হইল।

ফ্যালা বলিল, "আবার চালা যুগলো, তাগাদা দে কিপ্‌টে বুড়ীকে। কোনমতে বললে না, দেখলি।"

'বুড়ী! এই কিপ্‌টে বুড়ী'– যে কথাটা বললাম '

বেজায় মশা কামড়াইতেছে এবং আরও কিছু যে কামড়াইতে পারে, সে চৈতন্যটাও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মেজাজই ঠিক থাকে না, তো শীতলার' বিরক্তি ও রাগের মাথায় মা-শীতলা বেশ একটু চড়া গলায়ই হাঁক দিলেন–"বুড়ী' এই কিপ্‌টে বুড়ী' যে কথাটা বললাম "

"গাঁ গাঁ" করিয়া একটা বিশ্রী আওয়াজের সঙ্গে বুড়ী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ডাকিল —"সুদ্দু! সুদ্দু!- অ সুদাম!!... আলোটা বাড়িয়ে!! ..."

শেষ করিবার পূর্বেই চীৎকারের উপর আর একটা বিকটতর আওয়াজের সঙ্গে সুদামকে টানিয়া একেবারে হুড়মুড়িয়া নিচে পড়িল।- "ওরে বেরো ঘর থেকে! কি ঠেকলো হাতে লতার মতন - বালিসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে' কিলবিল করে উঠল! বেরো বেরিয়ে পড় শীগগির! .. মা রক্ষে করো রক্ষে করো মা" য টা পাঁঠা খেতে চাইবে "

।

এর পরের দৃশ্য আমাদের পাঠশালা। পরের দিন সকালবেলা। পাঠশালার সামনে বাদামতলাটায় বেশ ভিড় জমিযাছে, এক পাশে সুদাম আর সুদামের ঠাকুরমা। সামনের দিকটায় আমাদের পণ্ডিতমশাই, এক হাতে বেত এক হাতে একটা গড়গড়ার ছেঁড়া নলের খানিকটা। একটু বেঁকিয়া রাস্তার এক প্রান্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিযা দাঁড়াইয়া আছেন। মাঝখানে ভারত উদ্ধারের আমরা কযজন ফ্যালারাম ছাড়া। পণ্ডিতমশাই এবং আরও সকলে যেদিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিযা আছেন সেদিকে চাহিলে দেখা যায় একটি বড় মিছিলের মধ্যে, চ্যাংদোলা হইযা হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে এবং অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে ফ্যালারাম আগাইয়া আসিতেছে

কিন্তু, এই পর্যন্তই থাক্।

সেই থেকে পাঁঠা একেবারেই ছাড়িযা দিযাছি বলিয়া প্রশ্নটা মাঝে মাঝে এখনও মাথা চাড়া দিযা ওঠে, ভারত-উদ্ধার করিতে হইলে পাঁঠা কি খাইতেই হইবে?